যোগীবর বরদাচরণ

অমরনাথ রায়

যোগীবর বরদাচরণ

শ্রীঅমরনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৩১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

নিবেদন

ভারতীয় অকৃপণ কৃপালব্ধ লোকোত্তর কবি-প্রতিভার অধিকারী মহাকবি কালিদাস তাঁর অনবদ্য অমর কাব্যে বলেছেন :—

মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

—আমি মূঢ়, নির্বোধ হয়েও কবিকুলের যশ প্রার্থনা করছি—অতএব লোভবশতঃ উন্নতকায় পুরুষলভ্য ফলগ্রহণার্থে উত্তোলিত বাহু বামন যেমন উপহাসাস্পদ হয়—আমাকেও সেইরূপ উপহসিত হইতে হইবে।"

আমিও বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে উদ্যত হয়েছি—মূক হয়েও বাচালের অভিনয় করতে চলেছি—পঙ্গু হয়েও আমার অন্তরে গিরি-লঙ্ঘনের বাসনা জেগেছে—আধার একমাত্র ভরসা সেই

"পরমানন্দ মাধবের কৃপা।"

তাঁকে স্মরণ ক'রে—তাঁর চরণ বন্দনা ক'রে—'তৎকর্ম' আমি 'তৎপদেই' সমর্পণ করছি।

শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।

জীবনের কয়েকটা বছর যোগীরাজ বরদাচরণের সান্নিধ্য এবং সেবা পরিচর্যার অধিকার পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আনন্দের যে উচ্ছল বন্যাধারা ব'য়ে গিয়েছিল—সেই আনন্দ মন্দাকিনীতে যাঁরা অবগাহন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন—তাঁরাই কেবল তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সেই দিনকয়টি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দ সমুজ্জ্বল। তাঁর তিরোধানের পর আশা করেছিলাম যে তাঁর সান্নিধ্য-ধন্য ও শিষ্যকল্প কোনও সাহিত্যিক—তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিকও ছিলেন—ওই সময়টার

আনন্দময় আস্বাদটুকু অমর ক'রে ধরে রাখবেন। এ সম্বন্ধে পরিচিত কয়েকজন অনুরাগী ভক্তের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেই মহামানবের তিরোধানের এতকাল পরেও তাঁর জীবনের ২।৪টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা ছাড়া একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-ছবি আজও রচিত হল না। মনে একটা ব্যথা অনুভব করেছি। যাঁর সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে সংসারত্যাগী, জনসাধারণের বাইরে অবস্থিত সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষদেরও অভিমত—"বরদা যোগের একটা নূতন পন্থা আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিল"—এবং যার সম্বন্ধে যুগর্ষি, মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন "Greatest Yogi of Modern Bengal" (দেশ পত্রিকা ৭ই আশ্বিন ১৩৫৬)—এতে যে তাঁকে কতখানি মর্যাদা, কতখানি সম্মান দেওয়া হয়েছে তা কেবল যোগ রাজ্যের কিছু সংবাদ যাঁরা রাখেন, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন—তাঁর একটা জীবনেতিহাস তাঁর স্মৃতিরূপে রাখা সম্ভব হল না ?

একদিন এই চিন্তা নিয়েই শুয়েছিলাম। জানিনা সেই মহামানবের ইচ্ছায় কিনা—হঠাৎ স্বপ্নের রাজ্যে পেলাম তাঁর দেখা। স্পষ্ট, পরিষ্কার স্বপ্ন—সেই শালপ্রাংশু, তেজোদ্দীপ্ত, দিব্য কলেবর—স্নিগ্ধায়ত নয়ন দুটিতে সেই অন্তরসন্ধানী শান্তদৃষ্টি—মুখে সেই চির-দিনের পরিচিত প্রশান্ত মৃদু হাসি। মাথায় হাতখানি রেখে সুধা-নিস্যন্দী কণ্ঠস্বরে বললেন—"নিজের ইচ্ছার রূপায়ণ তো নিজেকেও করতে হয়।" ঘুম ভেঙে গেল—স্বপ্নদৃশ্যও অন্তর্হিত হয়ে গেল। চিন্তা করতে লাগলাম, আমার আন্তরিক ইচ্ছা পূরণের উপায় কি তিনি এইভাবেই নির্দেষিত করলেন।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে। আমি তো লেখক বা সাহিত্যিক নই। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা তো আমার নাই "ও বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই হয়।" তাছাড়া—কী আমি জানি তাঁর জীবনের কথা ? কতটুকুই বা জানি ? তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের ধারা কোন খাতে বয়ে গেছে—তাঁর ভাবনা, তাঁর

বেদনা—তাঁর আনন্দ—অভিজ্ঞতা—অনুভূতি এসব সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কই? কেমন ক'রে বলব তিনি তাঁর সারা জীবনব্যাপী সাধনায় কী পেয়েছেন কতটুকু পেয়েছেন? কতটুকুই বা তাঁকে দেখেছি—জেনেছি? দেখা বা জানার চাইতে না-দেখা, না-জানা অংশটাই তো অনেক—অনেক বেশী। তবু এ তাঁরই নির্দেশ—যাঁকে আমি আমার জীবনের আদর্শরূপে আমার জীবন-রথের অচ্যুত সারথীরূপে বরণ করে নিয়েছি। এ নির্দেশের অমর্যাদা করার সামর্থ্য তো আমার নাই। তাই এই অসাধ্য-সাধন প্রচেষ্টা।

যোগীরাজের জীবন কথা বলার মত করে আজও কেউ বলেন নি—একথা আগেও বলেছি। সেই না-বলা কথাই আমি অনেকের কাছে শুনে ততটুকুই কেবল জেনেছি—যতটুকু অমৃত তাঁরা তাঁদের স্মৃতিসাগর মন্থন ক'রে আহরণ করতে পেরেছেন। যতটুকু জেনেছি ততটুকুই লিখেছি। কেবল মাত্র আন্তর-প্রেরণা বশেই ভিন্ন ভিন্ন ফুল থেকে মধু আহরণ ক'রে মৌচাক ভরে রাখার মত অমৃত সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। মধু-রসিক ভ্রমরকুল এ রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হলে জানব আমার প্রচেষ্টা সার্থক।

এই পুণ্য-জীবনকথা সংগ্রহ করতে করতে আর তা লিপিবদ্ধ করতে করতে মনের অবচেতন স্তরে সেই মহামানবের পুণ্যস্পর্শ অনুভব করেছি। সেই স্পর্শটুকু আমার চেতনাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছে। জীবনকেও ক'রে তুলেছে রসাকুল। এই পুণ্য-স্পর্শানুভূতিটুকু যদি আমরণ ধ'রে রাখতে পারি তবেই আমার জীবন হবে সার্থক—হবে ধন্য।

এ রচনা আমার কাছে কেবলমাত্র স্মৃতি কথাই নয়। এ আমার হৃদয়ের আনন্দনির্ঝর। কর্মময় জীবনের সহস্রপ্রকার অসম্বদ্ধ ভাবনা চিন্তার অবসরে মন চলে যায় তার নীরব গোপন নিভৃত কন্দরে—যেখানে সঞ্চিত রয়েছে অমূল্য সম্পদ সেই মহামানবের অলৌকিক, অনির্বচনীয়, সজীব, সরস, প্রাণবন্ত পীযূষধারা। তাঁর জীবনের

প্রাত্যহিক মুহূর্তগুলো যে কত মাধুর্য-মণ্ডিত ছিল, তাঁর প্রতিটি আচরণ যে কত মনোরম ছিল—প্রতিটি কথা এমন রসসিক্ত ছিল—যাঁরা তাঁর সাহচর্য্যে এসেছেন তাঁরাই তার আস্বাদ পেয়েছেন। কত অনায়াসে যে তিনি তাঁর স্নেহক্ষরা অমৃতময় শান্তদৃষ্টি মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে পাঠাতে পারতেন—তা আমাদের অকল্পনীয়। সকলেরই প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ; মূঢ়তম নগণ্য লোকের সঙ্গেও যে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলতেন—সে ভাষাও ছিল কত প্রাণস্পর্শী—কত হৃদয়গ্রাহী।

সেই আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলো আর নাই। হারিয়ে গেছে মহাকালের নিরুদ্দিষ্ট বুকে। বিস্মৃতির অতলান্ত অন্ধকার হাত্‌ড়ে দু চারটি পরিবেশশূন্য কথা তুলে এনে কাগজে কলমে ধরে রাখার মধ্যে রয়েছে একটা সকরুণ ব্যর্থতা। হারিয়ে সবই যায়। হারিয়ে যাওয়ার জন্যেই সবকিছু নির্দিষ্ট। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র বস্তু—বড় রক্ষণশীল। কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না। হারিয়ে যেতে দিতে চায় না। পিছন সর্বদাই সুমুখকে টেনে রাখতে চায়—টেনে রাখে। "সম্মুখ উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ—দিব না দিব না যেতে—"। কিন্তু ধ'রে রাখা যায় না। সে থামে না। কারও কথায় কানও দেয় না—সাড়াও দেয় না। জীবনটা মরণ-যজ্ঞের হবনীয় হবি। জীবনের মূর্ত যা কিছু সবই চলে যায় সেই প্রদীপ্ত লেলিহান হোমকুণ্ডে। তবু আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে যাওয়াটাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম। "আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে—কহিতেছে শতবার যেতে দিব না রে।" কিন্তু ধরে রাখা তো যায় না। "তবু যেতে দিতে হয়—তবু চলে যায়।" তাই চলে গেছে অলৌকিক প্রভা-মণ্ডিত লৌকিক দেবদেহ—হারিয়ে গেছে সেই সহাস্য সরস প্রাণপ্রভা—থেমে গেছে মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত—মৃত্যুহীন—উদাত্ত-গম্ভীর।

"কারও জীবনের কথা বলতে গেলে অর্ধেক থাকে যাঁর জীবনের

কথা—বাকী অর্ধেক লেখকের নিজস্ব উক্তি।" বলে গেছেন পাশ্চাত্যের একজন সমালোচক। একথার সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। লেখকের নিজের কথা বাদ দিয়ে রচনা সম্পূর্ণ করা যায় না। মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার পিছনে একটা কিছু প্রেরণা থাকেই। প্রেম, পূজা, শ্রদ্ধা, অনুরাগ যা কিছুই হোক। তাই সে লেখায় লেখকের নিজস্ব ভঙ্গী, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ (angle of vision) প্রতিফলিত হবেই। তাই সরল সত্য ভাষণের জন্যেই শুধু নিজেকে এর সঙ্গে জড়াতে হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত কথাটুকু সম্পূর্ণ অপ্রধান—গৌণ। এর পিছনে আত্মপ্রসাদ লাভের কোনও দুর্গন্ধীবাসনা আমার নাই। বিধাতার অসীম অনুকম্পায় এবং মহামানবের অহৈতুকী কৃপায় যে আদর্শকে আমার জীবনে রূপায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেছি—শুধু তাই এখানে পরিবেশন করার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

আমার পরিবেশন যে সকলেরই মনঃপূত হবে এমন দুরাশা আমি পোষণ করি না। রচনার রূপ রস যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি বলে দাবীও করি না। সে বিচারের দায়িত্ব সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের। আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে যোগীরাজকে দেখেছি এবং চিনেছি সেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সেটা যে সর্বজনগ্রাহ্য হবেই এমন কথা বলার মত মূঢ়তাও আমার নাই। যাঁকে আমি আমার জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি—তাঁর মহাজীবনের এটা একটা সামান্যতম অংশমাত্র। সামগ্রিক রূপ অঙ্কিত করা আমার মত অশিল্পীর সাধ্যাতীত।

মহামানবগণের সাথে সাথে তাঁদের লীলাপার্ষদগণও লীলা-পুষ্টির জন্যে ধরাধামে এসে জন্ম নিয়ে থাকেন। বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে জন্মগ্রহণ করলেও, কেন্দ্রপুরুষের আকর্ষণে তাঁরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বিচিত্র নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন। এই রকম কয়েক জন—যাঁদের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁদেরও

সাধ্যমত চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। তাঁরা ছিলেন যোগীরাজের আনন্দলোকের সঙ্গী।

এই জীবন-ছবিখানি আঁকতে গিয়ে তার উপাদান সংগ্রহে আমার স্মৃতিভাণ্ডারই মূলধন। কত দিনের কত কথা—কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যাকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে কোনও মূল্য এতদিন দিই নি—আজ এতকাল পরে অতি যত্নে সঞ্চিত রত্নরাজির মত স্মরণের মঞ্জুষায় জ্বল-জ্বল ক'রে উঠছে। আমার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দিনপঞ্জীর পাতাগুলোকেও আমি অশ্রদ্ধা করি নি। এর উপর রয়েছে আমার শ্রুত-সঞ্চয়। প্রামাণ্য উপকরণরূপে গ্রহণ করেছি সুর-সুধাকর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সুরচিত গ্রন্থ "স্মৃতিচারণের" বরদাচরণ প্রসঙ্গটুকু। শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের রম্য-নিবন্ধ "শ্রদ্ধাস্পদেষু"র "যোগী বরদাচরণ" প্রসঙ্গ। এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি সাময়িক পত্র পত্রিকারও উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছি। সকলকেই আমি আমার অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থখানি প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে সর্বপ্রথম অনুপ্রাণিত করে আমার আত্মজ (মধ্যম) পরম স্নেহাস্পদ কল্যাণীয় শ্রীমান অশোক-কুমার। তার পৌনঃপুনিক অনুরোধ সেই সঙ্গে আমার পরম স্নেহাস্পদ দৌহিত্র কল্যাণীয় শ্রীমান তরুণকান্তির (কবি কান্তি ভরদ্বাজ) প্ররোচনা আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত ক'রে তোলে। এই প্রসঙ্গে আমার সোদর-প্রতিম স্নেহাস্পদ কল্যাণীয় শ্রীমান শিবচরণ মজুমদারের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবানের চরণে এদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

পরমপ্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীমদনমোহন ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি সর্বাধিক ঋণী। তাঁর অনলস প্রচেষ্টাই আমাকে কৃতার্থতার তোরণ সমীপে উপনীত করেছে।

সর্বশেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি "হিমাদ্রি"র মাননীয় সম্পাদক এবং সর্বজনআদৃত "ভারতের সাধক" গ্রন্থের প্রখ্যাত রচয়িতা, সহৃদয়,

সংসাহিত্যপালক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অহৈতুক অনুগ্রহের কথা। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্তসহযোগিতা এবং সহানুভূতি না পেলে আমার মত অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের পক্ষে এই গ্রন্থ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপন করা কখনই সম্ভব হত না। কৃতজ্ঞতা সূচক বাক্‌প্রবন্ধ উল্লেখ ক'রে তাঁকে আমি ছোট করতে চাই না। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম একটি নিঃশব্দ, বিনম্র নমস্কার।

ইতি—

দহড়পাড়
মুর্শিদাবাদ
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

নমস্কারান্তে
বিনীত গ্রন্থকার

সংক্ষিপ্ত বংশসূচী

৺রামচরণ দেবশর্মা (মজুমদার) : ৺রুদ্রাণী দেবী পিং ৺রামলোচন দেবশর্মা, বাস—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমার কাঞ্চনতলা গ্রাম।

- ৺দক্ষিণাচরণ দেবশর্মা (মজুমদার) : মাতঙ্গিনী দেবী, পিং ৺মথুরানাথ দেবশর্মা (চৌধুরী)
  বাস—পাহাড়পুর, থানা—লালগোলা
  জেলা—মুর্শিদাবাদ।
- ৺বামাচরণ দেবশর্মা (মজুমদার)
- ৺রমাচরণ দেবশর্মা
  (৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত)

৺বরদাচরণ দেবশর্মা (মজুমদার) : দনুজদলনী দেবী, পিং ৺তারকনাথ দেবশর্মা (চক্রবর্তী)
আবির্ভাব—১৬ই শ্রাবণ, শনিবার ১২৯৩ সাল
তিরোভাব—১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ সাল
পূর্ববাস—(পাটকেবাড়ি, নদীয়া)
বর্তমান—সৈদাবাদ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

- ৺বিমলা দেবী : নিশেশ সান্যাল
  বাস—দহরপাড়
  থানা—স্তূতী
  জেলা—মুর্শিদাবাদ
  (গ্রন্থকার)
- শ্রীশম্ভুচরণ মজুমদার
  :
  হাসিরাণী দেবী
  পিং অশ্বিনীকুমার রায়
  বাস—সলপ, পাবনা
  - বাণী দেবী। গৌরীশঙ্কর মজুমদার। পার্থপ্রতিম মজুমদার। মণিদীপা দেবী। মিতা। কেয়া।
- শ্রীশিবচরণ মজুমদার
  :
  উমারাণী দেবী
  পিং নিরঞ্জনকুমার ভাদুড়ী
  বাস—সৈদাবাদ, বহরমপুর
  - কিরীটেশ্বরী দেবী
  - মিলন মজুমদার : শিল্পী মজুমদার
    পিতা—সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী
    সাং—বহরমপুর
    জেলা—মুর্শিদাবাদ।
  - ঝুলন মজুমদার
  - বাসবী
- কমলা দেবী
  :
  ৺চুণীগোপাল মজুমদার
  পূর্ববাস—রাজসাহী
  বর্তমান—মজিদবাড়ি (২৪ পরগনা)
- শিশুপুত্র
  (৩ মাস জীবিত)

এক

১৩০১ সাল। আজ থেকে ৭৮ বছর আগেকার কথা। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যাঁর সম্বন্ধে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—দ্য গ্রেটেস্ট যোগী অব্ মডার্ন বেঙ্গল—সেই যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদারের চরিত-কথাই এখানে বর্ণনা করতে বসেছি। বিস্ময়কর লৌকিক আর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ছড়িয়ে আছে এই মহান্ পুরুষের সারা জীবনে। অক্ষম ও দুর্বল তুলিকা নিয়ে সেই শক্তিময় জীবনের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলতে বসেছি আমি। এ যে সত্যিকার দুঃসাহস, আমার চাইতে আর কেউ এ সত্যটি বেশী জানে না।

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম সীমান্তের একখানি গ্রাম—কাঞ্চনতলা। গ্রামের রাস্তার ধারে একটা বিশাল ছায়া-শীতল বটগাছ। গ্রামের ছেলেদের খেলার জায়গা। দুপুরের অনেক পথচারীরও বিশ্রাম স্থান। পাশে একটা বড় পুকুর। পাড়ে সারি সারি নারকেল গাছ। বিকেল-বেলা পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়া সূর্যের আলো পুকুরের জলের বুকে ঝিক্‌মিক্ করত। মন্দ-মন্দ হাওয়ার দোলায় দুল্‌তো নারকেল পাতার ঝালর। বটের ছায়া হ'ত দীর্ঘতর। পুকুরের ওপারের পাড়িতে কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে উঁকি দিত একফালি চাঁদ। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদী ছেয়ে যেত হাওয়ায় ঝ'রে পড়া রাশি রাশি

লাল পাপড়িতে। পাশের রাস্তা থেকে ভেসে আসত কর্মব্যস্ত লোকজন, গাড়ি ঘোড়া চলাফেরার বিচিত্র আওয়াজ। খেলা করত গ্রামের ছেলেরা মহা অনন্দে ওই ছায়ায় ঘেরা বটতলায়।

সেদিনও একদল ছেলে খেলা করছে সেখানে। হঠাৎ রাস্তার দিকে আঙুল তুলে একটা ছেলে সাথীদের বলল—"দেখ্, দেখ্ ভাই, একজন সাধু ওখানে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছে।"

সবাই পথের দিকে চেয়ে দেখল দিব্যকান্তি এক দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী, হাতে কমণ্ডলু ত্রিশূল; মাথায় দীর্ঘ জটা। চোখ দুটিতে পলকহীন স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

চেয়ে রয়েছেন এক কিশোরের মুখের পানে। তাঁর নীরব, নিশ্চল চোখ দুটি যেন বলছে "একি অপরূপ দিব্য লক্ষণসম্পন্ন কিশোর? এরকম তো সাধারণতঃ চোখে পড়ে না।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো সন্ন্যাসী বটগাছের তলায় এগিয়ে এলেন। নির্ভীক কিশোর কিন্তু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কাছে এলেন। সস্নেহে কিশোরটির কাঁধে হাত দিয়ে একান্তে নিয়ে গিয়ে মুখের পানে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন। চোখে মুখে ফুটে উঠল এক স্বর্গীয় আনন্দের দ্যুতি। কিশোরটির মেরুদণ্ডের একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আঙুল ছোঁয়ালেন। কি যেন বললেন তার কানে কানে। তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ উল্লাস স্নিগ্ধ শান্ত চোখ দুটিতে ফুটে উঠল। তারপর চলে গেলেন নিজ গন্তব্য অভিমুখে।

মুহূর্তের মধ্যেই সেই কিশোর যেন তলিয়ে গেল কোন অতল গভীরে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর গমন পথের দিকে। সন্ন্যাসী চলে গেলেন দৃষ্টিসীমার বাইরে। কিশোরটিও যন্ত্রচালিত মতো নিজ গৃহে ফিরে চলল। পিছনে প'ড়ে রইল খেলার সাথীরা। উপেক্ষিত হল তাদের সাগ্রহ আহ্বান।

এ কোন ছোঁয়া? এ কি সেই অসীমের ছোঁয়া, যা কিশোরটির মগ্নচৈতন্যে দোলা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে রূপান্তরিত ক'রে দিল?

একি সেই অমৃত-অবিনাশী স্পর্শ, সেই ইঙ্গিত, যা একটা জীবনের আমূল রূপান্তরের পক্ষে যথেষ্ট ? এই স্পর্শের কথাই কি বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দের অবতার সান্নিধ্যের অনুভূতির কথা ? One touch, one glance, can change a whole life.

সেদিন অপরাহ্নে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে অভিনীত বিচিত্র নাটিকাটির নায়কই বহুজনের পরম শ্রদ্ধেয় যোগীরাজ বরদাচরণ। উত্তরকালে দূর অতীতের এই ঘটনার সূত্রটি উল্লেখ ক'রে তিনি তাঁর গ্রন্থগীতা "দ্বাদশবাণী"তে বলে গেছেন তাঁর সাধনজীবনের ক্রমোন্নত পরিণতির কথা—"শাক্তবংশে আমার জন্ম। আমার শৈশব কাটিয়াছে সেই প্রভাবেরই মধ্যে। অথচ মাত্র ৮-৯ বৎসর বয়সের সময় কোথা হইতে কেমন করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" মন্ত্রটি আসিয়া আমার অন্তরের তারে জড়াইয়া গেল—সে ঘটনা এতই অলৌকিক যে তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার কোন সার্থকতাই নাই। সেইদিন উন্মুক্ত আকাশতলে বটবৃক্ষ মূলে ক্রীড়ারত বালকের মনে যে বিপর্যয় শুরু হইয়া গেল—তাহার জের যে কোথায় গিয়া মিটিবে তাহা অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন।"

বটগাছের তলায় খেলায় মত্ত বালকের জীবনে সেদিনের সেই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁর জীবন নাটকের একটা বিস্ময়কর নাটকীয় প্রস্তাবনা। তিনি লিখেছেন : "নিজের মনের মধ্যে সেই মন্ত্রটুকু লইয়া আড়ালে আড়ালে নির্জন অন্ধকারে লুকাইয়া ফিরিতে লাগিলাম। কিছুদিন এই মন্ত্রজপ ও ত্রিশূলধারী শিবমূর্তির চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে সেই মূর্তি সজীব হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সচলভাবে নড়াচড়া করিতেছেন—হাসি মুখে চাহিতেছেন—কত কি বলিতেছেন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। এইভাবে প্রায় ১০-১৫ বৎসর কাটিয়া গেল। আমার বয়স যখন ২৫-২৬ বৎসর তখন রুদ্ধচোখের সম্মুখে যেন বিরাটের আভাস লইয়া এক শ্বেত আকাশ ফুটিয়া উঠিল। অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে দেখিতে কিছুক্ষণের জন্য মন যেন

কোথায় হারাইয়া তলাইয়া অবলুপ্ত হইয়া গেল। ক্রমে শ্বেত আকাশ জ্যোতির্ময় হইতে লাগিল এবং প্রায়ই যেন একইভাবে হারাইয়া যাইতে লাগিল। বিচিত্র এক নিদ্রার মত বোধ হইত। কিছুদিনের মধ্যেই এইরূপ অবস্থা প্রাত্যহিক হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ময় আকাশ দেখি আর মন সাময়িকভাবে হারাইয়া যায়। অজানা আনন্দে হৃদয় মন প্রাণ ভরিয়া উঠে।" (দ্বাঃবাণী—পৃঃ ১৩০)

সাধারণ সংসারী মানুষের মতই তিনি জীবন পথের বাঁকে বাঁকে এগিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর বাইরের কার্যকলাপই শুধু দেখেছে। তারই বিচার করেছে। গুণগ্রাহী তাঁর প্রশংসা করেছে, দোষগ্রাহী নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছে। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে যে অদৃশ্য শক্তি নীরবে কাজ করে গেছে তার খোঁজ কেউ রাখে নি। হয়তো বা অনধিকারী বলেই রাখে নি। মাটির তলায় যে নিভৃত লোক, সেখানেই অরূপ অপরূপের আনন্দ ফল্গুধারা নিত্য প্রবাহমান। গাছের শিকড় সেই অদেখা স্তর থেকেই রস টেনে নিয়ে আকাশের তলায় থরে থরে সাজিয়ে দেয় কত বিচিত্র রঙের রাশি রাশি ফুল। তেমনি দুর্জ্ঞেয় লোকের আনন্দ-ফল্গুধারাও সাধকের দেহমন এক অনির্বচনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত ক'রে তোলে। বাইরের দর্শক দেখে পুষ্পপল্লবের অরূপ শোভা। অন্তরের আনন্দ ফল্গুপ্রবাহ সাধকের চিত্ত তলে যে নিভৃত অমৃতলোক রচনা ক'রে রাখে, সাধারণের চোখে তা তো ধরা পড়ার কথা নয়।

দুই

কুষ্টিয়া জেলার (অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ) কুমারখালির অন্তর্গত সাঁওতা গ্রামের এক ধর্ম-পরায়ণ, নিষ্ঠাবান্, বহু পরিজনপূর্ণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। অতিথিকে অন্নদান, আশ্রিত রক্ষণ এ বংশের একটা চিরাচরিত ব্রতস্বরূপ ছিল। ঐ অঞ্চলের সকলেই জানত যে সাঁওতার ঠাকুরবাড়িতে গেলে অভুক্ত কেউ ফেরে না। রামচরণ দেবশর্মা (মজুমদার) এই বংশের সন্তান। এ বংশের কোনও পূর্বপুরুষ তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একথা সেখানকার অনেকেই জানত। পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ সাধনাও করতেন শোনা গেছে। রামচরণ দেবশর্মা বাল্যকাল থেকেই ধর্মনিষ্ঠ, ও অতিথি বৎসল ছিলেন। বংশের সৎগুণগুলো সবই তাঁর ছিল। দেব দ্বিজে ছিল অচলা ভক্তি। যথাযোগ্য বয়সে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঞ্চনতলা গ্রামের অধিবাসী রামলোচন দেবশর্মার কন্যা রুদ্রাণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

রামচরণ দেবশর্মার এক অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সাধনাতেও বেশ উন্নতি করেছিলেন। কিছু কিছু যোগবিভূতিও লাভ করেছিলেন শোনা যায়। রামচরণও উক্ত যোগী মহাপুরুষের কাছে যোগ দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছায় তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন।

যোগীমহাত্মা রামচরণের মুখের পানে কিছুক্ষণ দেখে বললেন,

"বাবা! আমি তোমাকে দীক্ষা দেব না। তোমরা মহাশক্তি সাধকের বংশ। তোমার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তির পীঠ। তোমাদের কুল-গুরুও মহাকৌল তন্ত্রসিদ্ধ সাধক। তোমার চিহ্নিত গুরু তিনিই। দীক্ষা যথাসময়ে তিনি তোমায় দিবেন।"

তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে থেকে রামচরণকে বললেন, "তুমি ভাগ্যবান্। তোমার বংশে এক মহাযোগী জন্ম নিবেন। তাঁর আবির্ভাবে তোমার বংশ সমুজ্জ্বল হবে। তোমার বংশধারাটিও তাঁরই মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে একটা কথা মনে রেখো—সেই জাতকের অল্পবয়সেই বিবাহ দিও।"

রামলোচন দেবশর্মার পুত্রসন্তান ছিল না। তাই জামাতা রামচরণ মজুমদারকে নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে রাখার ইচ্ছা করেন; এবং এ প্রস্তাব রামচরণের অভিভাবকদেরও জানান। তাঁরা এবং রামচরণ নিজেও কাঞ্চনতলার তৎকালীন সুশিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবেশ, বিশিষ্ট ধনী জমিদার পরিবারের সান্নিধ্য, সর্বোপরি গঙ্গার তীর ইত্যাদি চিন্তা ক'রে জায়গাটি মনঃপূত হওয়ায় রামলোচনের প্রস্তাবে রাজী হন। রামচরণ এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দাগণ এবং জমিদার গোষ্ঠীও তাঁর ধর্মপ্রাণতা এবং ন্যায়নিষ্ঠার জন্যে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। রামচরণ মাঝে মাঝে সস্ত্রীক সাঁওতায় গিয়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসতেন। এই ভাবেই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

কালক্রমে রুদ্রাণীদেবীর গর্ভে তিনটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ দক্ষিণাচরণ; মধ্যম বামাচরণ এবং কনিষ্ঠ রমাচরণ। রমাচরণ মাত্র ৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যু কবলিত হন। যথাসময়ে দক্ষিণাচরণ ও বামাচরণের বিবাহ হয় মুর্শিদাবাদ জেলারই লালগোলার উপকণ্ঠস্থ পাহাড়পুর গ্রামের মথুরানাথ দেবশর্মা (চৌধুরী) মহাশয়ের দুই কন্যার সঙ্গে। দক্ষিণাচরণের সহধর্মিণীর নাম মাতঙ্গিনী দেবী।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের এক বর্ষণ মুখর শ্রাবণ সন্ধ্যা।

অবিরাম ধারাবর্ষণে যতকিছু সবকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঘাট, বাট মাঠ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্ধকারের অতল নিস্তব্ধতার উপর অবিশ্রান্ত ধারা পতনের ঝরঝর কলশব্দ যেন সেই অন্ধকারকে আরও ঘন, আরও গভীর ক'রে তুলেছে। এ ধারার যেন বিরাম নাই, বিরতি নাই, শ্রান্তি নাই, শেষ নাই—নাই অন্য কোনও বৈচিত্র্য। মনে হচ্ছে বোবা প্রকৃতি যেন কিছুটা বল্‌তে চায়। যেন সারা পৃথিবীকে দিতে চায় তার অন্তরের কোনও আনন্দবার্ত্তা। বাক্‌শক্তি নাই তাই একটা অবিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ অস্পষ্ট সুরকে আশ্রয় ক'রে অব্যক্ত ভাষায় যেন বল্‌ছে—"আমি নিয়ে এলাম আনন্দময় চিরসুন্দরের আনন্দ বার্তাবাহী দূত—যিনি বিস্মৃতির রাজ্যের সঙ্গে মিলনসেতু বাঁধার জন্যে চিহ্নিত।"

শ্যামগম্ভীর আকাশে বিজলী লাস্যের সঙ্গে একটানা গুরুগুরু ধ্বনি। মর্ত্ত্যের বুকে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা বরণের শুভ শঙ্খনাদ। এই শুভ লগ্নের নাদধ্বনির সঙ্গে মিলিত হল এক নবজাতকের কণ্ঠ নিঃসৃত 'ওঁয়া' 'ওঁয়া' শব্দ। ধর্মপ্রাণ রামচরণের শূন্য মন্দিরে এই ভরাবাদরে আবির্ভূত হল এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুদর্শন দেবশিশু। ১২৯৩ সালের ১৬ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় দক্ষিণাচরণের ঔরসে মাতঙ্গিনী দেবীর গর্ভে বরদাচরণের জন্ম হয়। পিতামাতার তিনিই একমাত্র সন্তান।

মাতঙ্গিনীদেবী অতীতের সেই মহাসাধকের ভবিষ্যৎবাণী রুদ্রাণী-দেবীর মুখে শুনেছিলেন। সেই থেকে ওই বাণীটুকু হৃদয়ের অতি নিভৃতে গোপনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সযত্নে লালন-পালন ক'রে আসছিলেন। সুতিকাগৃহে সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবশিশুটিকে দেখামাত্র তাঁর অন্তর থেকে যেন বলে উঠল—মহাসাধক নির্দেশিত এই সেই অধ্যাত্ম জগতের প্রতিশ্রুতিময় জাতক। এ বড় হবে, জগতের বুকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে। সীমাহীন বিশাল আকাশের বুকে প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্যের মত আপন জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ আলোময়

ক'রে তুলবে। তাই সদা সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে, সব দিক্ থেকে আগ্‌লে, স্নেহবারি সেচন ক'রে অঙ্কুরটিকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

আচরণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই পরিবারটি গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাই প্রতিবেশীদের স্নেহ আর আশীর্বাদের ফল রূপে সেই দেবশিশু দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আট বছর বয়সেই বরদাচরণের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। উপনয়ন রাত্রেই তিনি শিব দীক্ষা লাভ করেন। সে ঘটনা বড় অলৌকিক। সেই রাত্রে সুপ্তির ক্রোড়ে স্বপ্ন সমাহিত অবস্থায় দেখতে পান উর্ধ্বাকাশে এক বিশাল জ্যোতির্লিঙ্গ। সেই জ্যোতিস্তম্ভ ক্রমশঃ নেমে এল তাঁর অজিন-শয্যার পাশে একেবারে মাটির বুকে। দিব্য জ্যোতিস্তম্ভ তখন রজত-গিরি-নিভ দেবাদিদেব আশুতোষ শঙ্করের রূপে রূপান্তরিত। বরদাচরণকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কানে দীক্ষা মন্ত্রটি দিয়ে পুনরায় জ্যোতিরূপে বিলীন হয়ে গেলেন। এই তার গুরুদীক্ষা। অন্য কোনও মূর্ত মানুষ দীক্ষাগুরু তাঁর ছিল না।

মন্ত্রদীক্ষার এই রকম অলৌকিক এবং অবিশ্বাসী মনের অবিশ্বাস্য কাহিনী আরও অনেক খ্যাতনামা সাধকের জীবনেও ঘটেছে দেখা যায়। তাঁদের আত্মজীবনীতে মন্ত্রদীক্ষার এই অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখানেও স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর এসে মন্ত্র প্রদান করেছেন।

তিন

যোগীরাজ বরদাচরণের এই দীক্ষালাভের মূলে প্রধানতঃ তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনার পরিপক্কতা। জন্মান্তরের অর্জিত মহাসম্পদ। একদিকে সুউচ্চ সাধন-সংস্কারসম্পন্ন উচ্চাধিকারী শিষ্য, অপরদিকে কৃপাবর্ষণে সদাউন্মুখ মহাযোগেশ্বরেশ্বর আশুতোষ—স্বয়ং শঙ্কর। গুরুশক্তিতে উদ্দীপিত সাধকের একনিষ্ঠ সাধনা বলে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানা দুর্লভ অনুভূতি একের পর এক লাভ করতে বেশী বিলম্ব হয় নি।

বরদাচরণের বাল্য এবং কৈশোরকাল কাঞ্চনতলাতেই কাটে। তখনকার দিনে এ অঞ্চলে একমাত্র এখানেই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। এখানকার জমিদার ভগবতীচরণ রায়মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র শচীন্দ্রনাথ রায়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্যে ১৮৯৭ সালে (তাঁর পরলোকগত পিতা জগবন্ধু রায়ের নামে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং একজন সুযোগ্য ইংরাজ প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত করেন।) এই স্কুল থেকেই বরদাচরণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ষোল বৎসর।

জননী মাতঙ্গিনীদেবী এত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, একমাত্র পুত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবেন। তাই বিবাহ প্রস্তাবে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রুদ্রাণীদেবী তাঁকে অতীতের সেই

মহাযোগীর নির্দেশ বাক্যটি মনে করিয়ে দিলে মাতাঙ্গিনীদেবী আর আপত্তি করেন নি। যথা নির্দিষ্ট দিনে শুভলগ্নে বহরমপুর-সৈদাবাদ (পূর্ববাস পাটকে বাড়ি) নিবাসী তারকনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী দনুজদলনী দেবীর সহিত বরদাচরণের বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর পারিবারিক কারণে তাঁর লেখাপড়ায় একটা সাময়িক বিরতি ঘটেছিল। সে সময়টা অলস ভাবে বসে নষ্ট না ক'রে তিনি কাঞ্চনতলা স্কুলেই শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। বেশীদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি। কিছুদিন পরই আবার ছাত্রব্রত গ্রহণ ক'রে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। তখনকার দিনে কৃষ্ণনাথ কলেজ বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। সমগ্র বাংলাই কেবল নয়—বাংলার বাহির থেকেও অগণিত বিদ্যার্থী এই বিদ্যামন্দিরে লেখাপড়া করতে আস্‌তেন। তদানীন্তন বাংলাদেশের স্বনাম-ধন্য অধ্যাপকমণ্ডলী তখন এই বাণী মন্দিরের ঋত্বিক ছিলেন। তাঁদের শিক্ষাধীনে থেকে বরদাচরণ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্যে পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁকে গৃহ-শিক্ষকতা করতে হয়েছিল। সংগৃহীত অর্থে যে কেবল নিজেরই শিক্ষার খরচ চালাতেন তাই নয়, ঐ অর্থের কিয়দংশ তাঁর এক দরিদ্র অন্তরঙ্গ সতীর্থকে মাস মাস সাহায্য ক'রে তাঁরও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। তবু কারও কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাতেন নি। অথচ কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ঐ কলেজের বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজে বহন করতেন।

ছাত্রাবাসে থেকেও বরদাচরণ তাঁর নিজস্ব সাধনার ধারাটিকে সচল রেখেছিলেন। কলেজের দৈনন্দিন পাঠ, গৃহশিক্ষকের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সমাপন করার পর সতীর্থগণের অগোচরে গভীর রাত্রে তিনি আত্মসাধনায় বসতেন। কত তন্দ্রাহীন বিনিদ্র রাত্রি যে তাঁর

ওই সাধনার পিছনে ছিল তার খোঁজ কেউ রাখে নি। বুঝি উপলব্ধি করার কোনও চেষ্টাও করে নি। বিশাল অট্টালিকার বাইরের সৌন্দর্যই লোকের সমালোচনার বিষয়বস্তু, মাটির তলায় থেঁৎলে যাওয়া জমাট ধরা বনিয়াদটার কথা কেই বা ভাবে?

বরদাচরণ একটা আকর্ষণী শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সতীর্থমণ্ডলীও তাঁকেই তাদের দলপতি নির্বাচিত করত। সহপাঠীদের সব বিষয়েরই উপদেষ্টা ছিলেন তিনিই। তাদের নিয়ে একটা সাধকমণ্ডলীও গড়ে তুলেছিলেন ঐ ছাত্রাবাসে। বরদাচরণ প্রায়ই বল্‌তেন, "স্কুল-কলেজে অর্জিত জ্ঞান স্থুলবস্তুময় জগতের জ্ঞান। এর বাইরের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রাজ্যের বহু বহু তত্ত্ব এবং তথ্য জান্‌তে হবে। ব্যবহারিক বস্তু বিজ্ঞান তার সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের মাধ্যমে সেই কল্পরাজ্যে উপনীত হ'তে পারে না। পারে কেবল সাধকের যোগশক্তি।"

চার

আশ্রিতরক্ষণ ধর্মটি এই পরিবারের একটা পারিবারিক ঐতিহ্য। বরদাচরণের জননী মাতঙ্গিনীদেবীও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধিশালিনী। স্বামীর অকালমৃত্যুর নির্মম শেলাঘাতজনিত দুঃসহ ব্যথায় অন্তর বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও স্বামীর একমাত্র বংশধরের মুখের পানে চেয়ে বাহ্যতঃ তিনি ভেঙে পড়েন নি। শক্ত হাতে সংসারের পরিচালন দণ্ডটি ধরে সুকৌশলে সংসার পরিচালনা করতে পেরেছিলেন বলেই সমস্ত দায়িত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

মাতঙ্গিনীদেবী ছিলেন এক বিচিত্র ধাতুতে গড়া। কারও কোন অন্যায় নীরবে সইতেন না। তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। আবার কারও দুঃখ দেখলে তাঁর হৃদয় বিগলিত হত। প্রতিবেশীদের ঘরের সব সংবাদ নিতেন—প্রয়োজন হলে নিজের সাধ্যমত প্রতিকার করতে এগিয়েও যেতেন। কেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুনলে নিজে তার রোগশয্যার পাশে উপস্থিত হতেন। সাধ্যমত সেবাযত্ন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। কেবলমাত্র রন্ধন-নিপুণাই নয়—রান্না ক'রে লোকজনকে খাওয়াতেও খুব ভাল বাসতেন। পারতেনও। শ্রমবিমুখতা তাঁর ছিল না। পল্লীগ্রামের ভোজকাজে আজকের মত সে আমলে পাচক ব্রাহ্মণ দিয়ে পাক করানোর রেওয়াজ ছিল না। গ্রামের মেয়েরাই সে কাজ করতেন। ঐ রকম বৃহৎ ব্যাপারে মাতঙ্গিনী দেবীর ডাক পড়ত, আর তিনিও সানন্দে সে ভার গ্রহণ করতেন।

দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রেরা এসে কাঞ্চনতলা স্কুলে পড়াশুনা করত. কয়েকটি দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রকে তিনি নিজের কাছে রেখে লেখা-পড়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। সেই ছেলেরা পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল।

বৃদ্ধবয়সে মাতঙ্গিনীদেবী আমাদেরকে অতীত দিনের অনেক কাহিনী শোনাতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বরদাচরণের জন্মের রাত্রির এক অলৌকিক ঘটনার কথা এসে পড়ে। তিনি আমাদের যা যা শুনিয়েছিলেন, তাঁর কথাতেই নিচে উদ্ধৃত করলাম।

"আঁতুড়ঘরে ছেলে বুকে ক'রে শুয়ে আছি। ধাইমা আমার পায়ের দিকে শুয়েছে। ঘরের বাইরে দরজার পাশে শুয়েছেন আমার শাশুড়ী। রাত গভীর। অবিরাম ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। দরজার অন্যদিকটায় জ্বলছে একটা ধুনি।

[সূতিকাঘরের দরজার পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় গ'ড়ে উঠছে হাসপাতাল—প্রসূতিসদন। মানুষও ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে। প্রাচীনকালের প্রথাগুলো আজ তাই লুপ্ত]

কিছুক্ষণ আগে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ জেগে ছিলেন বুঝতে পেরে ছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি—জানি না। হঠাৎ ছেলের হাত পা নাড়ায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি সারা ঘরখানা আলোময়। ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ মেলে আছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটা রেড়ির তেলের মাটির প্রদীপ। তার আলো তো এত বেশী হবে না। তা হ'লে কি ধুনিটাই জ্বলে উঠল? উঁকি দিয়ে দেখি ধুনির বুকে আগুনের একটা ছোট্ট শিখাও নাই। মনে এল ভয়। শাশুড়ী ঠাকরুণকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, সে আলো আর নাই। শাশুড়ী ঠাকরুণ বেশ সজাগ গলাতেই বললেন—'আমিও দেখেছি বৌমা। তুমি কিছু ভয় কোরো

না। ছেলে বুকে নিয়ে ঘুমাও।' তাঁর কথায় কিছু আশ্বস্ত হলেও কি যেন একটা অজানা ভয়ে ঘুম আর এল না।"

সকালে শাশুড়ী ঠাকরুণ হাসতে হাসতে বললেন—"সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের বাণী এতদিনে ফললো। এ এক মহাপ্রতিশ্রুতিময় জাতক। এ ছেলেকে খুব যত্নে মানুষ কর।"

যুক্তিবাদী ও অবিশ্বাসী মন এ ঘটনাকে ঘটনার আকস্মিকতা বলে ধরে নিলেও—বিশ্বাসী মন বলবে যে চিহ্নিত মহামানবগণের সুতিকাগারের আশেপাশে অদৃশ্য নেপথ্য-বিধানের চিহ্ন বার বার দেখা গেছে। ইতিহাসের পাতাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাঁচ

বরদাচরণের বাল্যজীবনের কিছু কিছু গল্প, আমার বাল্যজীবনে আমার পিসীমার মুখে শুনেছি। কিছু কিছু ছোট ছোট ঘটনা আমার বাবা প্রসঙ্গক্রমে আজও বলেন। বলেন—৯০ বছর বয়সে দুর্বল স্মৃতিশক্তি যতটুকু ধরে রাখতে পেরেছেন কেবল ততটুকুই।

সে প্রসঙ্গে আমার আগে আমাদের দুই পরিবারের আত্মীয়তার কথাটা বলে নেওয়া দরকার। আমার পিতামহ এবং বরদাচরণের পিতামহী রুদ্রাণীদেবী ভাই বোন ছিলেন। অবশ্য সহোদর নয় এইটুকুই জানি। দক্ষিণাচরণ, বামাচরণ, মাতঙ্গিনীদেবীর এই সূত্রেই যাতায়াত ছিল। বরদাচরণ শিশুকাল থেকেই মাতঙ্গিনীদেবীর সঙ্গে এ বাড়ি আসতেন।

বরদাচরণ ছিলেন আমার বাবার সমবয়সী এবং খেলার সাথী।

এখানে আরও অনেক খেলার সাথী পেতেন তাই এখানে থাকতে খুব ভালবাসতেন। আমার পিসীমাকে তিনি মাসীমা বলে ডাকতেন। যা কিছুর প্রয়োজন—যা কিছু আবদার, সবই ছিল তাঁর মাসীমার সঙ্গে। সন্তানহীন মাসীমাও তাঁকে অন্তরের সঙ্গেই ভালবাসতেন—স্নেহ করতেন। অম্লানবদনে সমস্ত আবদার তিনি পূরণ করতেন।

বাল্যকাল থেকেই বরদাচরণ শিবানুরাগী ছিলেন। এখানে এসে খেলার সাথীদের নিয়ে প্রায়ই শিবপূজা খেলা হত। মাটি দিয়ে শিব গড়িয়ে মাসীমার কাছে এসে বলতেন, "মাসীমা শিবপূজার জন্যে ভোগ কি দিবে দাও।" আমাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা পূজার

জন্যে ভোগের উপকরণ থাকেই। মাসীমা তাঁকে কোলে নিয়ে বলতেন, "চল আগে তোদের ঠাকুর দেখে আসি, এসে ভোগ দিচ্ছি।"

মাসীমার ঠাকুর দেখতে চাওয়ার উদ্দেশ্য ঠাকুরের সেবাইতদের সংখ্যা নিরূপণ করা ও তদনুযায়ী ভোগের পরিমাণ নির্ধারণ করা। তারপর ভোগের উপকরণ পূজামণ্ডপে আসত। পূজা শেষে সেবাইতরা মহানন্দে প্রসাদ পেতেন। এই খেলাটিই বেশীর ভাগ হত।

একবার, তখন বরদাচরণের বয়স ৫-৬ বছর, মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছেন। একদিন এক ভিক্ষুক গান গেয়ে ভিক্ষা করতে করতে আমাদের বাড়িতে এল। ভিখারীটির গলা খুব মিষ্টি। সে গাইছে। শিবের গান শুনলেই তিনি আকৃষ্ট হতেন। বড় অদ্ভুত বালক। সব ছেলেই গান শুনছে ভিখারীটির সামনে দাঁড়িয়ে—বরদাচরণও রয়েছেন তাদের সঙ্গে। তাঁর চেহারার মধ্যে যেন ফুটে উঠছে একটা ভাব-তন্ময়তার আভাস। চোখদুটি বন্ধ—হাত দুখানা বুকের উপর। গান শেষ হল। ভিখারী ভিক্ষা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে বলেন একটু দাঁড়াও। ছুটে ভিতরে গিয়ে মাসীমার কাছ থেকে দুটি পয়সা নিয়ে এলেন। দিলেন ভিখারীর হাতে। বললেন—"গানটা আবার কর।"

ভিখারীটি হেসে বলল, "ওই গান তোমার ভাল লেগেছে খোকাবাবু? আচ্ছা আবার গাইছি।" সেই গান আবার গাইল।

উত্তরকালে বরদাচরণের এইসব বাল্যকথা প্রসঙ্গক্রমে উঠে পড়লে আমি দেখেছি আমার পিসীমার চোখে জল। নিঃসন্তান নারীর মর্মযাতনা বুঝি অশ্রুরূপেই আত্মপ্রকাশ করত।

আমার বাবার সঙ্গে বরদাচরণের সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। সে সখ্যতা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল অটুট। বাল্যের সেই বন্ধুত্বেরই পরিণত ফল আজকের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন। প্রাক্তন ছাত্রের জামাতায় রূপান্তরণ। ১৩২৮ সালের বাসন্তী পূর্ণিমার শুভলগ্নে বরদাচরণের প্রথমা কন্যা বিমলাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিণয় সূত্রে পুরাতন আত্মীয়তায় নতুন গ্রন্থি সংযোজিত হয়।

ছয়

পরদুঃখকাতরতা, পরসেবাপরায়ণতা নারীজাতির অলঙ্কার স্বরূপ। এঁদেরই গৃহলক্ষ্মী বলা হয়। যে পরিবারে এই গুণসম্পন্না নারী বিরাজ করেন সে পরিবারের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন। বরদাচরণের সহধর্মিণী দনুজদলনী দেবীও গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা। সত্য সত্যই সুগৃহিণী। ধর্মপ্রাণা, দেব দ্বিজে অচলা ভক্তিমতী।

কেবল যে তিনি নিজ পতি-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতি নিজ পরিজনের সেবাতেই রত থাকতেন বা আজও থাকেন, একথা সত্য নয়। দুঃখীর দুঃখ মোচনে সাধ্যমত তৎপর হওয়া তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কোনও প্রার্থীকেই তিনি বিমুখ করেন না। বরদাচরণের কর্মজীবনে কত দরিদ্র ছাত্র যে তাঁর আশ্রয়ে থেকে শিক্ষালাভ ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নাই। যত ছাত্র আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে তাঁর কাছে এসেছিল সকলকেই তিনি সমান বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত ক'রে রেখেছিলেন। সবাই তাঁর কাছে সমান মাতৃস্নেহ লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিল। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণা। যেন একেবারে মূর্তিমতী করুণা।

তাঁর শাশুড়ী মাতঙ্গিনীদেবীর মতই তিনিও কোনদিন পরিশ্রমে কাতরা হন নি। পরিবারবর্গের সেবা, অতিথি অভ্যাগতের যথোচিত পরিচর্যা সমস্তই তিনি একা হাতে ক'রে গেছেন।

স্বামীর সঙ্গে তিনিও যোগসাধনা করতেন। সাধনার পথে নিজের

অগ্রগতির, উন্নতির, জন্যেই বরদাচরণ তাঁর সহধর্মিণীকে তাঁর সাধন-পথের সঙ্গিনী ক'রে নিয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর একাসনে যোগসাধনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি সাধন পথের পথিক হন, তাহা হইলে পরস্পরের সাহায্যে অনতিকাল মধ্যে দ্বিদলে স্পন্দন সুখের অধিকারী তাঁহারা হইতে পারিবেন। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে জীবনের সমস্ত কিছু জটিলতা একে একে অপসারিত হইবে। স্ফটিক-স্বচ্ছ মনে তখন সত্যের জ্যোতি প্রতিফলিত হইবে এবং সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরপারে যে নির্ভয়, নিঃশঙ্ক আশ্রয় আছে সেখানে পৌঁছিয়া উভয়েরই অন্তর প্রেমসুন্দরের অপার্থিব স্পর্শে ধন্য হইবে।" (দ্বাদশবাণী—পৃঃ ৮৭)

উত্তরকালে দনুজদলনী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র এবং দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ পুত্রটি জন্মের তিন মাস মধ্যেই কালসমুদ্রে হারিয়ে যায়। প্রথমা কন্যা ১৩৫৮ সালের ২০শে অগ্রহায়ণে, ৪৪ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করে।

স্বামীর যোগৈশ্বর্য সম্বন্ধে দনুজদলনী দেবী যা দেখেছেন এবং জানেন—তার কিছু কিছু এখনও তিনি বলেন। অতীতের অনেক কথা তাঁর আজও মনে আছে। এমনকি আশ্রিত সব ছেলের কথাই তিনি মনে রেখেছেন। আজও কত কিছু বলেন। এই আশী বছর বয়সেও স্মরণশক্তি প্রখর।

একদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন গোটা ঘর এক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে। আর তাঁর স্বামী এক কোণে ধ্যানাসনে সমাসীন। কিন্তু কি আশ্চর্য, মাটির সঙ্গে তাঁর দেহের কোনও সংস্পর্শই নাই। গোটা দেহটাই শূন্যে ঝুলে রয়েছে।

দনুজদলনীর দেবীর কথা ঃ

"একদিন এক শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের বধূ স্বামী সঙ্গে বরদা চরণের কাছে এলেন। বললেন, 'তাঁর ক্রমান্বয়ে কন্যাসন্তানই হচ্ছে। তারা বেঁচেও আছে। পুত্রসন্তান আজ পর্যন্ত একটিও হয় নি। স্বামীর

বংশ রক্ষা কি করে হবে? কোনও উপায় যদি থাকে তাহলে বলে দেন।'

বরদাচরণ মন দিয়ে শুনলেন। মহিলাটির মুখের পানে একবার চেয়ে দেখে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ছোটবেলায় নাচতে খুব ভালবাসতে। কেমন না? মহিলাটি বললেন—"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগ্‌ত। নাচতে পারতামও খুব ভাল। নাচের জন্যে কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছি।"

বরদাচরণ বলেন, "পূর্বজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়? কিন্তু ঐ নাচই তোমার বর্তমান মনোকষ্টের একমাত্র কারণ।"

স্বামী স্ত্রী দুই জনেই বিস্মিত হয়ে বরদাচরণের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। মুখ দেখে মনে হল কথাটা ঠিকভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না তারা।

বরদাচরণ বুঝলেন, কথাটা তাদের মনে কোন রেখাপাত করল না। বললেন, "আচ্ছা মা, বলত তোমার নাচের নতুন নতুন ভঙ্গী আর মুদ্রা স্বপ্নদৃষ্ট কোন নর্তকীর অনুকরণ কিনা?"

মহিলাটি চরম বিস্মিত হয়ে বলল—"হাঁ, একথা সত্য। কিন্তু—আপনি আমার স্বপ্নের কথা জানলেন কেমন করে?"

বরদাচরণ—"যেমন ক'রে তোমার নাচের কথা জানলাম। বরদাচরণের মুখে এক রহস্যময় মৃদুহাসির রেখা। বললেন, "শোন মা, তোমার পূর্বজীবনের কথা। স্বপ্নে দেবমন্দিরে নৃত্যরতা যে দেবদাসীর দেখা তুমি পেতে সে অন্য কেহ নয়। সে তুমিই। তুমিই পূর্বজন্মে ছিলে ঐ মন্দিরের তন্বী দেবদাসী। নিজের লীলায়িত লাস্যের এবং রূপের খুব অহঙ্কার তোমার ছিল। একবার সে মন্দিরে এসেছিল এক অপূর্ব দর্শন, সুকুমার তরুণ পরিব্রাজক। মন্দরটির শান্ত সুন্দর পরিবেশ আর অবস্থান তাকে মুগ্ধ করেছিল। সাধন ভজনের অনুকূল ক্ষেত্র বুঝে, ওই মন্দিরের এক নির্জন কোণে সে আশ্রয় নিয়েছিল। তুমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে। তার প্রতি আকৃষ্টা হ'য়ে তোমার

ওই সুন্দর রূপ আর ললিতলাস্যে তার মনে বিভ্রম জাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু সে তরুণ সাধক ছিল উচ্চ সংস্কারসম্পন্ন এক নির্লিপ্ত বৈরাগী। শেষে তোমার জন্যেই সে ঐ মন্দির ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। মন্দির ত্যাগের কালে তার মনে যে গভীর ক্ষোভের উদয় হ'য়েছিল সেই ক্ষোভই অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে তোমার বর্তমান জীবনে। পুত্র সন্তান তোমার হবে না মা। কন্যাদের নিয়েই সুখী হওয়ার চেষ্টা করো।"

—স্থানীয় এক ধনী ভদ্র পরিবারের কুলবধূ নানাপ্রকার জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত। সমস্ত রকম চিকিৎসাই বিফল হয়েছে। শেষে এসেছেন বরদাচরণের কাছে। সমস্ত বিবরণ শোনার পর মহিলাটিকে সম্মুখে বসিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর উদরের নিচের অংশে একটা বড় কাল দাগ আছে কিনা? বধূটি প্রথমতঃ অস্বীকার করল। শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হল। বরদাচরণ আর কোনও কথাই প্রকাশ করলেন না। কেবল বললেন, "পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ না ক'রে উপায় নেই। যাই হোক এর প্রতিকার করার চেষ্টা করতে হবে। কোনও তন্ত্রসিদ্ধ পূজককে দিয়ে কালীপূজা করাতে হবে। রাত্রির মধ্যেই প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে নিরঞ্জনাদি সমস্তই শেষ করতে হবে। আর এই মন্ত্র (বলে দিলেন) সকাল সন্ধ্যা প্রত্যহ জপ করতে হবে।"

মহিলাটি এখন পুত্র পৌত্রাদি সহ পরিজন পূর্ণ সাজানো সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

—আর বিচিত্র একটা ঘটনার কথা তিনি বললেন আর একজন অভিজাত পরিবারের গৃহিণী সম্বন্ধে। জীবনে কোনদিন তিনি ভাত খেতে পারেন নি।

ভাত পেটে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যেত। অন্য [illegible] খাবারই

খেতে পারতেন। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। ৩।৪টি সন্তানের জননী। অনেক রকম চিকিৎসার পর বরদাচরণের শরণাপন্ন হন?

বরদাচরণ প্রথমতঃ তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা ক'রেছিলেন। ভদ্রমহিলার কাতর অনুনয়ে শেষে ধ্যানস্থ হলেন। পরে বললেন, "আরোগ্য লাভের আশা তোমাকে ছাড়তে হবে। এ তোমার পূর্ব-জন্মের পাপের ফলভোগ।"

ভদ্রমহিলা—এমন পাপ কী করলাম যার ফলে এই অস্বাভাবিক অবস্থা?

বরদা—বললে কি বিশ্বাস হবে?

ভদ্রমহিলা—হবে। আপনি বলুন।

বরদা—পূর্বজীবনে তুমি অত্যন্ত বদরাগী ছিলে। রাগ হলে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তোমার থাকতো না। কিন্তু কোন জন্মের সঞ্চিত কিছু পুণ্যও ছিল। যার জন্যে এক অতিথিবৎসল ধার্মিক পরিবারের বধূ হতে পেরেছিলে। সেই শান্ত ধর্মনিষ্ঠ পরিবারেও অশান্তির আগুন জ্বলতে দেরি হল না। সংসারের কর্তৃত্ব তোমার হাতে আসার পর এক দুপুরে তোমার বাড়িতে এলেন এক ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর প্রচ্ছন্ন সাধক। তোমার স্বভাবধর্ম সেই ভোজনে উদ্যত অতিথির মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। অতিথিকে অকথ্য ভাষায় অপমান করতেও বিবেকে বাধে নি। ক্ষুধার্ত অতিথির তীব্র মনোব্যথা অভিশাপ রূপে এ জীবনে প্রকট হয়ে তোমার মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে।

ভদ্রমহিলা—কি করলে পরজীবনে এই অভিশাপের হাত থেকে রেহাই পাব?

বরদা—শিবপূজা, শিবমন্ত্র জপ। অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারলে পরবর্তী জীবন শান্তি-ময় হবে।

তার সুর সাধনা হ'য়ে ওঠে সার্থক। সঙ্গীতকে আমি ক্ষণিক আনন্দের বস্তু বলে মনে করি না। সুর বা নাচই সেই চিন্ময়-পুরুষের সর্বপ্রথম স্থূল রূপ। তাই সুরের বা নাচের মধ্যে ডুবে যেতে পারলে সেই চিন্ময় বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সহজেই লাভ করা যায়।"

আমার বাবা বাল্যকাল থেকেই খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের অবাধ সুরের খেলায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। সেকালে এই অঞ্চলে বিখ্যাত গায়ক রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। সে সময় এ বাড়িতে রীতিমত সঙ্গীতচর্চা হত। দূর দূরান্তের বহুবিখ্যাত গায়ক এ বাড়ি এসেছেন। বরদাচরণ সেসময় নিমতিতা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বাবার মুখে গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। সেইজন্যে প্রায়ই এবাড়ি আসতেন। বাবার জানা কয়েকটি ভাবপ্রধান গান তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাবাও তা জানতেন। গান শুনতে চাইলেই গাইতেন—

"এ জীবন দিলে তব ঋণ কি শুধা যায়?
হে দীনশরণ তুমি আকিঞ্চন ধন দয়াময়—
এদেহ আত্মার তরে ভূভাণ্ডার মুক্ত করে
তুমি দিয়াছ হে কৃপানিধি দিয়াছ হে আপনায়
অসীম করুণা তব কি আছে মম বিভব
কি আর তোমারে দিব বিকায়েছি রাঙা পায়।
জননী জঠর হ'তে পালিতেছ বিধিমতে
নয়নে নয়ন রাখি নাশিছ বিপদচয়॥"

কোনও দিন বা ভাবময় কণ্ঠে গাইতেন—

"আর কবে দেখা দিবি মা ওমা হর মনোরমা॥"

গান শুনতে শুনতে বরদাচরণ ধ্যান-তন্ময় হয়ে পড়তেন। দেখে মনে হত যেন চলে গেছেন সীমার নাগাল ছাড়িয়ে কোন্ অব্যক্ত কল্পলোকে। তাঁর এই স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায় বাবার কণ্ঠেও সুর যেন প্রাণ পেয়ে অসীম উন্মুক্ত নীলাকাশে ডানা মেলে অবাধ গতিতে উড়ে

চলত। সেই স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশে মনে পড়ত বিশ্বকবির অনবদ্য রচনা—

"একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে।"

ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার দিকেও তাঁর একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রও আরও ৬।৭ জন সঙ্গীত শিক্ষার্থী নিয়ে নিজ বাড়িতেই গানের স্কুল করেছিলেন। লালবাগের (মুর্শিদাবাদ) বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষক ও তবলা বাদক ওস্তাদ কাদের বক্স মিঞাকে শিক্ষক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির বহুলাংশ নিজে খরিদ করে দিয়েছিলেন।

ওস্তাদজীর সংগীত শিক্ষার অবসরে কোনও কোনও দিন বরদাচরণের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত। কোনও কোনও দিন সংগীতও আলোচ্য বিষয় ভুক্ত হয়ে পড়ত। একদিনের আলোচনা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছিল। বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

কাদের বক্স মিঞা একদিন বরদাচরণকে জিজ্ঞাসা করলেন— মাষ্টার বাবু, মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব ভাবধারা কি?

বরদাচরণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন—ওস্তাদজী, ও সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই অস্পষ্ট—নাই বললেও চলে। তবে সুর আমি ভালবাসি। ভালবাসি সুরের অবাধ খেলা। সুরের মধ্যেই আমি স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারি—তাঁর স্পর্শ পাই।

ওস্তাদ কাদের মিঞা বিস্মিত হয়ে বললেন—সুরের মধ্যে আপনি ভগবানের স্পর্শ পান?

বরদাচরণ—হ্যাঁ পাই। সুর যে ভগবানেরই শব্দময় প্রথম অভিব্যক্তি। স্থূল বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আদিতে ভগবানের প্রথম বিকাশ সুরের রূপে—শব্দের রূপে। এই শব্দ বা সুরের অনেক সংজ্ঞা আছে—যেমন ধ্বনি, নাদ ইত্যাদি। 'নাদ' শব্দের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় থাকার কথা?

ওস্তাদ—আমাদের সংগীতশাস্ত্রে 'নাদ' শব্দের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে নাদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদ দুইরকম।

বরদাচরণ—অব্যক্ত নাদই অনাহত শব্দ। হিন্দুদর্শন অব্যক্ত নাদ বা অনাহত শব্দকেই ব্রহ্মনাদ, বা নাদব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম, পরাশব্দ ইত্যাদি বহুনামে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণব দর্শনে এই নাদ বা শব্দকেই বলা হয়েছে অব্যক্তের আড়ালে লুকান শ্যামল-কিশোরের ত্রিজগতের'মন আকর্ষণ করা মুরলীর ধ্বনি। আপনাদের Prophet হজরৎ মহম্মদও এই সুপবিত্র ধ্বনি বা নাদ সুস্পষ্টভাবে সবখান থেকে ধ্বনিত হচ্ছে শুনতে পেয়েছিলেন।

"Hazrat Mahammad, * * * * heard distinctly the sacred cry of'ALLAH HUN ALLHUN all through"[1] হিন্দু দর্শনের পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনি, যাকে 'প্রণব' নামে অভিহিত করা হয়, বৈষ্ণব মতে যাকে সুরশ্যামলের বংশীধ্বনি বলা হয়, মূলতঃ সেই নাদ ধ্বনির সঙ্গে ইসলাম দর্শনের "আল্লা হুঁ" শব্দ একার্থ বোধক। (I belive Allah Hun of Hazrat Mahammad and the Owm Hun of the Brahamins mean the same thing and name the same Eternal glory···)[2] সাধক ভক্ত সকলেই ঐ অনাহত নাদের সন্ধানেই এগিয়ে চলেছে। যিনি ঐ নাদধ্বনির সন্ধান পেয়েছেন তাঁর চাওয়া পাওয়ার অবশিষ্ট কিছু নাই। নাই কোনও ভেদাভেদ জ্ঞান। জীবনব্যাপী কাঁদনেরও হয়ে গেছে এককালীন অবসান। সব বাঁধন থেকে তিনি পেয়েছেন মুক্তি। নাদই ঈশ্বরের স্বরূপ—নাদই তো আত্মা— "নাদ এব আত্মা।" আবার সংগীত এই নাদ দ্বারাই গঠিত। গীতং নাদাত্মকং "।

বর্তমান কালের সংগীত সাধনার ধারা এই ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাই সংগীতের সেই স্বর্গীয় সুষমাও ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। সংগীতের বাহ্যরূপকে পূর্ণাবয়ব করে ফুটিয়ে তুলতে হলে অন্তরের দ্বারে আঘাত করাই সুর-সাধকের অন্যতম কর্তব্য বলে আমার মনে হয়।”

বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে ওস্তাদ কাদের মিঞা এতক্ষণ বরদা-চরণের মুখের পানে চেয়েছিলেন। বরদাচরণ নীরব হতে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন—“মাষ্টারবাবু, সারা জীবন ধরে আমরা সংগীতের রূপ নিয়েই মাতামাতি করে এলাম। কল্পনাও করতে পারি নি যে তার আন্তর-রূপের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে এমন অনন্ত সুষমা, অপরূপ রসমাধুরী। আপনিই সংগীতের সত্যস্বরূপের পূজারী—শ্রেষ্ঠ সুররসিক।

আট

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজত্বের অন্তিম কাল ঘনিয়ে এল। উত্তরাধিকারীরা আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। তারই ফলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতিও প্রায় স্তব্ধ। দেশে, বিশেষতঃ বাংলায় বৃটিশ প্রাধান্যের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রভাব বেড়ে চলেছে। সেই যুগসন্ধিতে বিজাতীয় ভাবধারার প্রবল আবর্তে অনুকরণ-প্রিয় বাঙালী জাতি নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার আহার-বিহার, বেশভূষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এমন কি ধর্মান্তরণও ঘটতে আরম্ভ করেছিল। একটা সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির জীবনে এহেন অধঃপতন অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিঃসন্দেহে। তবে সৌভাগ্যের কথা আত্মবিলুপ্তির এই ভাবাবেগ জাতীয় জীবনে বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। শতাব্দীর পড়ন্ত বেলায় এই স্রোত ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। হিন্দু-জাতীয়তা ও ঐতিহ্যের এক সদ্য জেগে-ওঠা ভাববন্যা জাতির বিহ্বল দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনেছিল পিছনে ফেলে আসা যুগের পানে। এর মূলে ছিলেন যুগাবতার পরমহংসদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ, ছিলেন ভক্তবীর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ইত্যাদি। এঁরাই প্রবর্তন করলেন নব-ধর্ম-জাগরণের। শতাব্দীর সর্বশেষ পাদের এক পুণ্যলগ্নে জ্ঞানের দীপ্র দীপশিখা হাতে এই নবজাগ্রত প্রাণবন্যার থিতিয়ে পড়া পলিমাটির বুকে এসে দাঁড়ালেন যোগীরাজ বরদাচরণ।

মহাকবি সেক্সপীয়র বলেছেন,

"The world is a stage. Man and women are mere players. They have their own entrance and exit."

—এ সংসার একটা বিশাল রঙ্গালয়। দুই পাশে দুটি চির অর্গল মুক্ত দ্বার। আগমন ও নির্গমন পথ। অগণিত নটনটী ঐ পথে নিত্য যাতায়াত করছে। নেপথ্যের মহানীরব লোক থেকে রঙ্গমঞ্চের রহস্য ঘেরা কুহেলী আলোকে প্রবেশ করছে। আপন আপন ভূমিকা শেষে নির্গমন পথে ফিরে যাচ্ছে অজানা নেপথ্যের চিরতমিস্র নিস্পন্দতায়, যাওয়ার পথে সবাই কিন্তু মঞ্চের বুকে পদরেখা এঁকে যেতে পারে না। অল্পসংখ্যকই কেবল রেখে যান তাঁদের পদাঙ্করেখা। অন্য কোন'ও জন ঐ ধূলি তুলিকায় আঁকা পদ-রেখা ধরে জীবনের পথে—পথ ভুল না ক'রে—এগিয়ে যেতে পারেন।

ধুলোয় ভরা পথের বুকে পায়ের চিহ্ন রেখে যাঁরা যেতে পারেন, তাঁদের আসা যাওয়ার বিচিত্র পরিবেশকে আকস্মিক বলে মেনে নিতে মন চায় না। স্থান, কাল, পাত্র এবং পরিবেষ্টনী সবগুলো মিলিয়ে দেখলে চিন্তাশীল মনে ধরা পড়ে একটা অব্যক্ত—অদৃশ্য—অস্পষ্ট পরিকল্পনার আভাস। একটা লোকোত্তর ইচ্ছার সংকেত। বরদাচরণ এই রকম আগন্তুকদের অন্যতম। তিনি তাঁর স্বতন্ত্র চরিত্র বলে, স্বকীয়তা প্রভাবে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে যেতে পেরেছেন এই ধরণীর ধুলোভরা বুকে।

বরদাচরণ ব্রাহ্মণোচিত দেবদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতিটাও ছিল তদনুরূপ। তাঁর প্রকৃতিই তাঁকে স্বাতন্ত্র্যের পথে, মানুষ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করে ছিল। তাই তিনি সব অধ্যয়ন—অধ্যাপনাকে, শিক্ষকতাকেই জীবনব্রত রূপে বেছে নিয়েছেন। নইলে সেকালের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের পক্ষে—অর্থ উপার্জনই মূল লক্ষ্য হলে, অনেক কিছু করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রচুর অর্থাগমের অযাচিত সুযোগ—স্বদেশ তো বটেই, বহির্ভারতের

একাধিক স্থান থেকে তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসেছিল। কিন্তু সে সব প্রস্তাব তিনি অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই গ্রন্থেরই যথা স্থানে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রকৃত মানুষ হঠাৎ দুই একটাই চোখে পড়ে। দেখে মনে হয় তাঁরা যেন সৃজন বিধানের ব্যতিক্রম। বরদাচরণও ছিলেন ঐ রকম প্রকৃত মানুষ। নিজের সহজাত চরিত্র গুণে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার নিয়েই এই মরণ-লালিত পৃথ্বির বুকে নেমে এসেছিলেন। এটাই তাঁর নিজত্ব। তাঁর অন্তরস্থ মানবতার স্বাধীনতা। এই স্বকীয়তা প্রভাবেই মহামানবগণের মত ইনিও একদিক দিয়ে ছিলেন স্বতন্ত্র, অনন্য, একক। অন্যদিক দিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির সহোদর স্বরূপ। সমবর্ণ, স্বজাতি। আচার ব্যবহার, বেশভূষার দিক দিয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ বাঙালী। অথচ স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়ে, নিজত্বের দিক্ দিয়ে তাঁর ছিল নির্ভীক বলিষ্ঠতা, অদম্য সত্যনিষ্ঠা, লোক হিতৈষা, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরতা।

সাধারণ সংসারী মানুষ চিরাচরিত রীতিনীতির দাস। পারমার্থিক চিন্তাকরার মত সজীব মনোভাব তাদের নাই। কেবল ছককাটা নিয়মের অনুসরণ করে যাওয়াকেই তারা প্রাধান্য দিতে অভ্যস্ত। কবি এদেরই বলেছেন গতানুগতিক। এরা জটিল সংসার যন্ত্রের খেলার পুতুল। অন্ধ সংস্কারের হাতছানিতে ভুলে অবশে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে অনেক সময় পথ ভুলে আন-পথেও গিয়ে পড়ে। এদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করার শক্তি নাই। জানার ইচ্ছা বা চেষ্টাও মনের কোণে উঁকি দেয় কিনা সন্দেহ। তাদের অন্তর্মানবকে তারা জন্মলগ্নের ঊষাকাল থেকে মৃত্যুলগ্নের উষসী পর্যন্ত অন্তরের মণিকোঠায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে। অবশ্য পারমার্থিক চিন্তা যে তাদের মনে কখনও কোনও দিনই উঁকি দেয় না একথা হয়ত সত্য নয়। হয়তো কখনও কখনও গুমোটের পর একটা দমকা হাওয়ার মত মনটাকে একটু নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। মনের পাতায়

কোন দাগ পড়ার আগেই আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতার মত সেই ক্ষণিকের দোলা কোথায় কোন আবর্জনা স্তূপের মধ্যে গিয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির দুর্বার ঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। কিন্তু পারমার্থিক লোক গতানুগতিক কখনও হয় না। চিরাচরিত রীতিনীতি মহা-মানবদের কখনও অবদমিত করতে পারে না। বরদাচরণকেও পারে নি। অব্যক্ত অমৃত লোকের অপ্রমেয় আনন্দরসে মধুমুগ্ধ মধুপের মত নিজ জীবনটিকে তিনি করে রেখেছিলেন আপ্লুত। অশেষ প্রকার প্রতিকূলতা তাঁর গতিবেগকে রোধ করতে পারে নি। পারে নি তাঁর পূর্বজন্মসিদ্ধ যোগশক্তিকে পরাজিত করতে। উদ্‌বেগশূন্য ব্যক্তি জীবনের সুখ, শান্তি, পারিপার্শ্বিকতার মধুর স্বপ্ন, কত প্রলোভন পিছন থেকে তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল। ডেকেছিল তাঁর পরিজন—তাঁর সংসার। কিন্তু চোখের সামনে সব কিছুকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ—অপূর্ব, অনবদ্য মাধুর্য নিয়ে। তাই তিনি একলক্ষ্যে উন্মাদিনী মুক্তধারা জাহ্নবীর মত সমস্ত অচলায়তনকে তুচ্ছ করে তাঁর সহজাত তপস্বীর মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুসম্বদ্ধ, গভীর। চিন্তার স্তরে স্তরে ছিল স্বাতন্ত্র্যবোধ। দিব্যলক্ষ্য ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথা। আদর্শে সমুজ্জ্বল, বিশ্বাসে অটল, সিদ্ধান্তে স্থির। অসাধারণ মনোবল এবং অবিচলিত ধৈর্য সহায়ে অবলীলায় এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অভিলষিত লক্ষ্যে। সেদিনের বিদ্যার্থী মণ্ডলীর খ্যাতিমান আচার্যরূপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করলেও তাঁর যোগসাধন ও সিদ্ধির খ্যাতি শিক্ষকতার খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সাধনপ্রতিভা তাঁকে ঔপনিষদীয় মুনিঋষিগণের মতই দিব্য ও জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞা দৃষ্টির সঙ্গে সুপরিচিতই শুধু নয়, সেই দৃষ্টিশক্তির অধিকারীও করেছিল। অনন্ত বিশ্বের বহু অজানা অচেনা রহস্য— বিজ্ঞানীর চোখে যা আজও অনুদ্‌ঘাটিত-ঘনতমসায় আবৃত, বরদাচরণ তাঁর সাধনার সন্ধানী-আলোতে সে রহস্যজাল

ছিন্নভিন্ন করে তাকে স্পষ্টতার আলোয় আনার সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন।

জড়বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে অধ্যাত্মরাজ্যের অলৌকিক অঘটন কাহিনী সর্বগ্রাহ্য নয়। বরং উপহাস্যকর। এ পরিহাসের কারণ দুর্বোধ্য। বিজ্ঞান সাধনায় জড়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রমাণিত যে স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তরে, অণু অনীয়ানে উপনীত হল। পরীক্ষা নিরীক্ষার চরম পরিণতি সূক্ষ্মতমে—অম্বিষ্টে। জড়দেহ তখন আর নাই। জড় তখন চেতনে রূপান্তরিত। অগ্রগতির বিরাম তবু নাই। চেতনও পরিণাম প্রাপ্ত হল বিশ্বের বিস্ময়কর মহাশক্তির অব্যক্তগর্ভে। বিজ্ঞান তখন অধ্যাত্মবাদে রূপান্তরিত, পদার্থবিদ্যা দর্শনে। জড়ের বিরাট দেহে কোথায় ছিল দুজ্ঞের্য় ঐ অনুরূপী মহাশক্তি? বিজ্ঞানের পক্ষে এই মহারহস্য উদ্ঘাটন আজও সম্ভব হয় নি। জগৎ ও জীবন রহস্যের অর্গলবদ্ধ দ্বারগুলোর সবকটি খুলতে জড়বিজ্ঞান এখনও পারে নি। কিন্তু তার্কিকদের সীমাঘেরা অহমিকাকেও বিস্মিত করে দেয় যোগী-তপস্বী-ভক্ত সাধকদের অঘটনী প্রতিভা। যুক্তি তর্ক সমাধানের পথ নয়। পথ আন্তরধ্যান। এই পথেই কেবল বোধিলোকের আলোর প্রভায় রহস্যময় বিচিত্র লোকের বদ্ধদুয়ার উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।

তাই বলে বুদ্ধি কখনও উপেক্ষা বা অনাদরের বস্তু হতে পারে না। বুদ্ধি যতক্ষণ আত্মাভিমানে মাথা উঁচু করে থাকে ততক্ষণই বিশ্বাসকে সে মেনে নিতে চায় না। চায় না অজানা-অদেখা চিন্ময় অতীন্দ্রিয় সত্যবস্তুকে স্বীকার করতে। আত্মাভিমানের পথ আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু আমাদের বোধসীমার মধ্যে আসে না। কিন্তু স্রষ্টার অমোঘবিধানে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই হোক মানবিক চেতনা একদিন না একদিন পূর্ণ বিকশিত হবেই। জন্মজন্মান্তর—রূপরূপান্তরের ব্যবধানে পূর্ণ বিকশিত বুদ্ধি-তত্ত্বেই আত্মস্মৃতি লাভ করবে। সেই বুদ্ধিতত্ত্বেই ধরা পড়বে পরা-শক্তির স্পন্দন। অসীমার সালোক্য তখনই হবে মানবচৈতন্যের সীমায়ত্ব। সে বুদ্ধি জগদ্ভাব মুক্ত প্রজ্ঞা।

নয়

বরদাচরণ তাঁর কৈশোর কাল থেকেই যোগীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রথম প্রভাতে মুক্ত আকাশতলে বটের ছায়ায় ক্রীড়ারত বালকের মন যে স্থির লক্ষ্যে নিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেই লক্ষ্যে অচঞ্চল থেকেই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সুচারু রূপে শেষ করে গেছেন। বিন্দুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। সব কিছুর মধ্যেই তিনি অমূর্ত সত্য-শিব-সুন্দরকে আস্বাদন করে গেছেন। সংসার ত্যাগের প্রয়োজন বোধ করেন নি। গিরিগুহা আশ্রয় করার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে গেছেন। এসম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"অনেকে বলেন সংসারে থেকে সাধনা করা অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় সংসার ত্যাগ ক'রে যে সাধনা তাই অস্বাভাবিক। মানুষের সঙ্গে সমাজের যে সম্বন্ধ বর্তমান, তা মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। সমাজের সংস্পর্শে এসে যে মন সামাজিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সেই মনকে সম্পূর্ণ নাশ করা সহজ সাধ্য নন। বনে পালিয়েও যদি মনের চাঞ্চল্য থেকেই যায় তবে বনে পালিয়ে লাভ কি? আমার মনে হয় সাধনার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে নির্জন বাস করা যেতে পারে; তাই বলে সংসারের সম্বন্ধ ত্যাগ করা সঙ্গত নয়। যাঁরা বীর সাধক তাঁরা সংসারের মধ্যে থেকেই যে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।" (পথহারার পথ—পৃঃ ২৭)

তাঁর কথার অলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। উত্তর জীবনে অসামান্য যোগশক্তি এবং সাধনবিভূতির অধিকারী হয়েও পরম নির্লিপ্তির সঙ্গে সংসার আশ্রমের যাবতীয় দায়দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে পালন ক'রে গেছেন। বহিরঙ্গ জীবনের হাসি, কান্না, সুখ দুঃখ, কর্মচঞ্চলতার মধ্যেও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ যোগজীবনের নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত প্রশান্তিটি অনায়াসেই রক্ষা ক'রে গেছেন। তিনি ছিলেন গৃহী, সংসারী। মাতা, স্ত্রী, কন্যা, আশ্রিত, ছাত্র, প্রভৃত সম্পত্তি—একটা পরিপূর্ণ সাজান সংসার।

সাধারণ লোক জীবনের একটা দিকের সঙ্গেই কেবল পরিচিত। সেটা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজীবন। এ ছাড়াও যে জীবনের আর একটা দিক্ আছে সে দিক্‌টা তাদের চোখে অনস্তিত্ববৎ। তার কোনও সন্ধানই তারা জানে না। কল্পনা করতেও পারে না। সেটা মননশীল অন্তর জীবন বা মনোজীবন। এই জীবনই ছিল যোগীরাজের মুখ্যজীবন। তিনি ছিলেন সেই মননশীল অন্তর-রাজ্যের অধিবাসী। সে রাজ্য সাধারণ-স্তরের মানুষের অগম্য—অবোধ্য। তাঁর চিন্তা, বুদ্ধি, আনন্দবেদনা সবই ছিল পারমার্থিক। তাই সাধারণ সংসারী মানুষের মত বহির্জীবনের সুখ দুঃখ ভোগ করেও তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় চেতন জীবনের অর্থাৎ অন্তর্জীবনের সুখ দুঃখাদি, এক কথায় পারমার্থিক আনন্দবেদনা সমস্তই ভোগ করতে হয়েছে। আন্তর জীবনের তুলনায় বহির্জীবনের আনন্দবেদনাদি নগণ্য। এই দ্বিতীয় জীবনের আনন্দবেদনার গভীরতা সংসারী মানুষের তো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর অন্তর্জীবনের দুঃসহ বেদনায় সমগ্র সংসারটাই তাঁর চোখে অকিঞ্চিৎকর ব'লে প্রতিপন্ন হলেও তিনি তাঁর প্রাণশক্তির জোরে আন্তর মনের উত্তাপে করণীয় সব কিছুই ক'রে গেছেন। কারও সহায়তায় প্রত্যাশী তিনি হন নি। স্বতন্ত্র পুরুষ। আপনার পারমার্থিক সচেতনতার শক্তিতে সব বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে জীবন রণাঙ্গনের প্রত্যন্ত সীমা অবধি জীবনের জয় পতাকা বহন ক'রে একাকী বীরদর্পে

এগিয়ে গেছেন। প্রকৃত বীর সাধক। অনুক্ষণ বিষাক্ত বিষয়রসে ডুবে থেকেও, মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ মহাদেবের মত সেই বিষের অন্তর্নিহিত অমৃত আস্বাদন করতে করতে—সত্য-দিব্য-অনন্তকে লক্ষ্য পথে স্থির রেখে—দৃঢ় ঋজু পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন, কেন্দ্রপুরুষের অভিমুখে। লক্ষ্য ছিল তাঁর অসাধারণ। অসাধারণ ছিল কর্মধারা। দুটি বিপরীত-মুখী ধর্মকে একত্রে পাশাপাশি রেখে—অর্থাৎ বাহ্য জীবনের সম্ভোগ আর মননশীল আন্তর জীবনের অনাসক্তি—ভোগ এবং ত্যাগ—দুইয়ের সমন্বয়ে সমন্বিত জীবন যাপন ক'রে মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন।

তাঁর নিজস্ব সাধন প্রণালীও ছিল ভোগও নয় ত্যাগও নয়। অথচ ভোগ আর ত্যাগ ছায়ার মত তাঁর পিছন পিছন ফিরেছে। জাগতিক সমস্ত কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তির হাওয়া আস্বাদন করেছিলেন। গ্রহণ তিনি করেছিলেন সবই কিন্তু তদ্দারা বদ্ধ হন নি। ত্যাগ যা করেছিলেন সবই অন্তরের ত্যাগ। সে ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কিছু ছিল না। সংসার জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন ক'রে গেছেন। কোনও কিছুই এড়িয়ে যান নি। অথচ কোন কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারে নি। মোক্ষ বা মুক্তি কোন কামনাই তাঁর ছিল না। ত্যাগ ভোগ একই সঙ্গে আস্বাদন করার এই ব্রহ্মক্ষুধা তাঁকে পরম সার্থকতার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। অসাধারণ সাধন-সংস্কার নিয়ে এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর বাল্য কৈশোর যৌবন বয়োমধ্য সবখানেই দেখা যাচ্ছে একই সুষম গতিছন্দ। একই মুমুক্ষাপথের অনুস্মৃতি।

দশ

সারাজীবন গৃহী যোগী রূপেই তিনি যোগমাহাত্ম্য প্রচার ক'রে গেছেন। সকলকেই স্বধর্মানুযায়ী পথে এগিয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সাধন পথের বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বধর্ম সাধন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর গ্রন্থগীতা দ্বাদশবাণীতে বলেছেন ঃ—"স্বধর্ম বস্তুটির সন্ধান পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া সাধক মাত্রেরই জীবনের প্রধান কর্তব্য। কারণ স্বধর্মের সন্ধান না পেলে স্বধর্ম পালন এবং স্বধর্ম পরিপোষণ রূপ উভয়বিধ শাস্ত্র নির্দেশই নিরর্থক হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য এবং পরিণতির যে বিশেষ ধারাটি তিনি আমার মধ্যে বিকশিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন—তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার স্বধর্মের ইঙ্গিত। অনন্ত কোটি সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বিলম্বিত সূত্ররূপে কল্পিত সেই অনন্ত স্বধর্ম ধারার একপ্রান্তে শিবরূপে তিনি—অন্যপ্রান্তে প্রসারিত জীবরূপে তাঁরই অসংখ্য বিকাশকে নিরন্তর নিজের মধ্যে আকর্ষণ করছেন। অতএব কেন্দ্রগত স্বধর্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগ অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে ধীরে ধীরে তাঁর এই চুম্বকময় আকর্ষণের পথে আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে পারি তাহাই সকল সাধনার মূলমন্ত্র স্বধর্ম সাধন। (পৃ ১২১)

মানুষমাত্রেই নিজ নিজ সংস্কারানুগ প্রবৃত্তির বশে জীবন পথের লক্ষ্য স্থির করে। কেউ তার ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ড খণ্ড আনন্দ নিয়েই মনে করে আমরা বেশ সুখে রয়েছি। সে আনন্দের

কণাগুলো হোক সীমাঘেরা—হোক না অনিত্য। তবু "বয়ং-কৃতার্থাঃ"। আবার কেউবা সীমাহীন সমষ্টি জীবনের সর্বানুস্যূত আনন্দ জলধির অপ্রমেয়তার সঙ্গে নিজের ব্যষ্টিগত খণ্ড আনন্দের নিবিড় যোগসূত্রের মাধ্যমে সেই পরম রসামৃত ধারা পান ক'রে ধন্য হয়। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন—কেহ বা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অচেতন। শুধু অচেতনই নয় সম্পূর্ণ উদাসীন। নদীর স্রোতে ভেসে চলা ঝরা পাতার মত কুলহারা কালস্রোতে কোন অজানা লক্ষের পানে এগিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্যহীন তার চলার পথ। কিন্তু চিরদিন কখনও একভাবে চলে না। এটাই ভগবানের বিধান। একদিন এমন আসবেই আসবে যেদিন জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জাগবে সচেতনতা। জাগ"ব প্রশ্ন। সেই প্রশ্নই পরাপ্রশ্ন। সমগ্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা নিয়েই বরদাচরণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই জটিল, বিভিন্নমুখী পরিবেশ, মানুষের জীবনবোধের অস্পষ্টতার মধ্যে বাস ক'রেও তিনি ছিলেন স্থিরপ্রজ্ঞ। সংকল্পে অনড়। জীবনবোধ তাঁর ছিল স্থির। জীবনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রশ্নটিও ছিল স্পষ্ট। উত্তরটিও ছিল তাঁর বোধায়ত্ত। তাই প্রবহমান যুগের ভাবধারার মধ্যে ডুবে থেকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট তিনি হন নি। পাশ্চাত্যের রীতিনীতি অনুসরণ তিনি করেন নি একথা সত্য—পাশ্চাত্যকে অশুচি বলে ঘৃণা বা অবমাননাও করেন নি একথাও ঠিক তেমনি সত্য। সব সম্প্রদায়ের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের মধ্যেই ভালমন্দ আছে। পাশ্চাত্যের ভাল অংশটির অকুণ্ঠ প্রশংসা তিনি করেছেন। প্রশংসা করেছেন তাদের অনমিত পৌরুষ, সবল মেরুদণ্ড, প্রচণ্ড দুঃসাহসের জন্মগত অধিকার, কর্মোন্মাদনা, তাদের সংগঠন শক্তি, নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির। সমস্ত রকম বিপদকে অগ্রাহ্য ক'রে চলার, মানুষের মত বাঁচার শক্তি তাঁর অসংকুচিত সাধুবাদ লাভ করেছে। প্রাচীনপন্থী ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। অতীতের আচারসর্বস্ব রীতিনীতি প্রথা ও বিশ্বাসের কোলে মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই পুরাতনের অন্ধভক্ত তিনি ছিলেন না। এটাও তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন কালের আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের যে হৃদয়হীনতা জগদ্দল পাষাণের মত দেশের বুকে বসে কণ্ঠরোধ করেছিল, সেই রীতিনীতির ক্ষুদ্রতা, বাঙালীর জাতীয় জীবনের সহজাত ধর্ম জড়ত্ব বা ক্লীবত্বকে ভেদ ক'রে আপন গতিবেগে বিরাট প্রতিকূলতার বেড়া ভেঙে মনুষ্যত্বের অভিমুখে নিজ জীবনকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ধনীর দুলাল তিনি ছিলেন না। ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মানুষ। বাল্যকাল থেকেই অনেক বাধাবিপত্তি ঠেলে তাঁকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছিল। অসাধারণ মনোবলই তাঁর এই সাফল্যের গোড়ার কথা। বুদ্ধি ছিল তাঁর অতীন্দ্রিয় বস্তু-ধারণায় তৎপর। চিত্ত ছিল বিকারশূন্য। কর্ম ছিল নিষ্কাম। নিন্দা স্তুতি সমভাবে উপেক্ষা ক'রে অভীষ্টসিদ্ধির পথে চলতে হলে যে অবিচলিত ধৈর্য, যে সাহসিকতার প্রয়োজন তা তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। সর্বোচ্চ গৌরবের বস্তু ছিল তাঁর অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য, নিজের অন্তর রাজ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যে অদম্য নিষ্ঠা, ধর্ম-বুদ্ধিকে জয়ী করার অনমিত পৌরুষ। এসবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জন্ম জন্মান্তরের অনলস সাধনার ফলস্বরূপ। প্রকৃত মহত্ত্ব তাঁর এইখানেই। এইসব গুণের ফলশ্রুতিতেই সার্থক জীবনের জয়টীকা ললাটে এঁকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন ক'রে যেতে পেরেছেন।

বরদাচরণ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ। কখনও কোন কিছুর জন্যে কারও কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। সবক্ষেত্রেই অন্তর্মানবের অভীপ্সার অনুবর্তী হয়ে চলতেই অভ্যস্ত ছিলেন। আবার অন্যদিক দিয়ে ছিলেন অমায়িক, নিরহংকার। অনুরাগী ভক্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু, অভিজাত এবং বিদগ্ধ সমাজ সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিচের দিকের খেটে খাওয়া মানুষ সবাইকেই

সমান চোখে দেখা, সমান আদরে গ্রহণ করা, সহজ সরলভাবে আলাপ করা মানবপ্রেমিক বরদাচরণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। মিষ্টি কথায়, স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়ে তুষ্ট ক'রে কত সহজে যে তিনি লোককে আপন ক'রে নিতে পারতেন তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

তাঁর উপদেশগুলো ছিল উপলব্ধ সত্যের ভিত্তিতে সমুজ্জ্বল, সাধনালব্ধ অনুভূতিমণ্ডিত। অন্তরঙ্গ এবং অনুরাগীদের কাছে প্রসঙ্গ-ক্রমে মাঝে মাঝে তাঁর যোগজীবনের অলৌকিক বিচিত্র কাহিনী, অভিনব দর্শন এবং যোগরাজ্যের বিভিন্ন প্রকার রহস্য বর্ণনা করতেন।

শূন্যগর্ভ ধর্মালোচনায় তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। বলতেন—"পাণ্ডিত্যাভিমান মানুষকে অন্তঃসার শূন্য ক'রে তোলে। তাই প্রকৃত ধর্মজীবন গড়ে তুলতে অনুশীলনই একমাত্র প্রয়োজন। অভ্যাস বা চর্চা ছাড়া অধীত বিদ্যা—বিদ্যার্থীকে বিরুদ্ধ ভাবগুলোর কবল মুক্ত করতে পারে না। ফলে ধর্মজীবনও গড়ে উঠে না।" তাই তিনি সর্বাগ্রে অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর উপদেশ ছিল :—"আমাদের প্রাত্যহিক কর্মজীবনের সঙ্গে সনিষ্ঠ আত্মানুশীলন। আত্মানুসন্ধান কর্ম বিজড়িত থাকলে তবেই জীবনের পথে উন্নতি সম্ভব। আর একটা একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আত্মবিশ্বাস, যা বর্তমান যুগে দুষ্প্রাপ্য। তাই ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ এবং ভক্তি জনিত অনাবিল শান্তি, মানুষের কাছে আজ সুদূর পরাহত। আত্ম-সচেতনতা বা আত্মবোধ অধ্যবসায় সাপেক্ষ। ব্যর্থতা বা বিফলতায় ভেঙে পড়লে চলবে না। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে, অধ্যবসায় সংকারে অগ্রসর হ'তে হবে। অদম্য অধ্যবসায় অটল ধৈর্য। আঘাতকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ ক'রে সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হবে। নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ স্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনের চরমতম লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি, আত্মস্বরূপানুভূতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। স্বস্বরূপানুভূতিই মুক্তি।"

এগার

বর্তমান সমাজ-জীবনে আশ্রমিক গুরুকরণের একটা প্রবল ঢেউ লেগেছে। ঐ রকম দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু দলে দলে বরদাচরণের কাছে এসে ভিড় করেছিলেন। কিন্তু গুরুবাদের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গুরুকরণ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল—গুরুলাভ মানেই ভগবৎ কৃপাশক্তি লাভ। ওই ঐশী কৃপার বেগ ধারণ করতে গেলে নিজ ক্ষেত্রটিকে সেই প্রবল বেগ ধারণক্ষম ক'রে তুলতে হবে। গঙ্গাধর ছাড়া গঙ্গাপতনের বেগ কে ধারণ করতে পারে? তাই হতে হবে গঙ্গাধর। তিনি লিখেছেন—"মানুষ যতই কেন বাহিরের উপদেশ গ্রহণ করুক না শেষ পর্যন্ত নিজের মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে আদেশ ধ্বনিত হয় তাহাই সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠে।" (দ্বাদশ বাণী পৃঃ ৫) তাই একান্ত নির্ভরযোগ্য এবং অভ্রান্ত নির্দেশের জন্য তিনি আত্ম উপলব্ধিরই পক্ষপাতী ছিলেন।

সরল বিশ্বাসে যাঁরা গুরুবাক্য, শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলেন তাঁরা বহু বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পান একথা সত্য। সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে মানুষের চেতনার উচ্চতর ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতের সব কিছুই এগিয়ে চলেছে। চলেছে রূপ থেকে রূপান্তরের পথে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের কর্তব্যগুলো ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ে। অবশ্য করণীয় বলে যেগুলোকে মনে হত, হয়ত সেগুলো

অনাবশ্যকের কোঠায় গিয়ে ঠেকে। কত কত কর্তব্য আবার পরিবর্তিত রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। নিত্য নতুন পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ে মানুষ হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। সমাধানের তাগিদে তখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে শাস্ত্র বাক্য, ঋষি নির্দেশ, মহাজন বাক্য, গুরুর আদেশের মধ্যে সেই জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজতে। কিন্তু ঐ সব বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ক'রে কে বলে দেবে সত্য কি ?

কবি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন :—

"মর্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া সেই সত্য ; অন্য সত্য নাই।" কিন্তু মর্মবাণী বা আত্মার আদেশ উপলব্ধি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। চঞ্চল মন সেই বাণী ঠিক শুনতে বা বুঝতে সব সময় প্রতি-বন্ধক সৃষ্টি ক'রে চলেছে। সেই চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে তবেই সেই বাণী শুনতে হবে। তার জন্যে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। পথ অবশ্য বহু আছে। "যত মত তত পথ"। যে পথ যার কাছে যত সহজ সরল বলে মনে হয় সেই পথ ধরেই সে চলতে পারে। এক পথই তো সবার জন্য নয়। যে যে পথেই যাক্ সব পথের শেষেই সেই একই স্পন্দন। ওই স্পন্দনকে আশ্রয় ক'রে চললেই অভীষ্ট লাভ হবে।

বরদাচরণ যে কেবল গুরুবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন না তাই নয়। কোনও বাদেরই বালাই তাঁর ছিল না। কোনও বাদকেই তিনি প্রাধান্য দেন নি। কোনও বিশিষ্ট মতবাদেরই তিনি পোষকতা করেন নি বা করতেন না। কোন মতবাদের প্রতি অসহিষ্ণুও ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মতবাদ বা আদর্শ ছিল অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ভগবৎ সান্নিধ্যের পথে অগ্রসর হওয়া। পরম পিতার পরম শুভ্র জ্যোতি দেহে ও মনে নামিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে অভেদাত্ম হওয়া। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :—

"পথ বহু হলেও গন্তব্য একই। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।

সব পথেই কল স্পন্দন অনুভব করা। একটু স্থির মনে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে সর্বত্রই শক্তির স্পন্দন প্রতিনিয়তই চলছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই সঙ্গে চলছে। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেও এই সৃষ্টি ও ধ্বংস ক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়। জীবন ও মৃত্যু প্রবাহ জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই ক্রিয়া ক'রে চলেছে। একই জায়গায় আমরা দুটি বিরুদ্ধ শক্তির বিপরীত কার্যকরী শক্তির পরিচয় পাই। একটা অন্তর্মুখী অপরটি বহির্মুখী। এই দুই বিপরীত শক্তির নিয়ামক কে? পরিচালক কে? পরিচালক বা নিয়ামক কেন্দ্রশক্তি। এই কেন্দ্র শক্তিকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। তিনি যে পথেই যান না কেন শেষ গন্তব্য এই কেন্দ্রশক্তি। উদ্দেশ্য সব পক্ষেরই এক। ভগবৎ প্রেম লাভ। এই পরা প্রেমই ব্রহ্মজ্ঞান।

বার

১৯১৪ সাল।

সদ্য স্নাতক বরদাচরণ ছাত্রজীবন শেষ ক'রে শিক্ষক জীবনে প্রবেশ করলেন। অধ্যাপনার ব্রতে হলেন ব্রতী। বি. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার পরই লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর একমাত্র পৌত্র কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (কলকাতার বর্তমান শেরিফ) গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। এ কাজে খুব বেশী দিন তিনি ছিলেন না। ১৯১৫ সালের ৬ই জুলাই সহকারী প্রধান শিক্ষক রূপে মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা গ্রামের গৌরসুন্দর দ্বারিকানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে এসে স্থানীয় কয়েক জন সুশিক্ষিত অভিজাত বংশের সন্তানকে নিজের অন্তরঙ্গ রূপে পেয়েছিলেন। উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি। জমিদারবাবুরা তৎকালীন ছাত্রাবাসের নিচের তলায় বড় রাস্তার উপর একটা প্রশস্ত ঘরে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর সুখ সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল।

১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী বরদাচরণ নিমতিতা গৌরসুন্দর

দ্বারিকানাথ ইন্‌সটিটিউসনের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। পূর্বতন প্রধান শিক্ষক আশুতোষ মুনশী অবসর গ্রহণ করেন।

জাতশিক্ষক বরদাচরণের সমগ্র জেলার গণমানসে আদর্শ শিক্ষক-রূপে পরিচিত হতে এবং প্রতিষ্ঠালাভ করতে বেশী বিলম্ব হয় নি। সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে—শুধু তাই নয়—সমগ্র বাংলা ও বিহার অঞ্চল থেকেও দলে দলে তরুণ ছাত্রমণ্ডলী এই শিক্ষামন্দিরে এসে সমবেত হয়েছিল। এ সময় ছাত্র সংখ্যা অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দূর দূরান্তের গ্রামগুলি থেকেও দলে দলে ছেলেরা এসে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছে।

বরদাচরণ কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম ও যোগজীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী শিক্ষাও দিতেন। অনেক ছাত্র তাঁর কাছে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভ ক'রে যোগ-জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক ছাত্রকে পরবর্তী জীবনে দেশের বিপ্লব আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকরূপে রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্থানীয় এম, ই, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিমতিতা হাইস্কুলে যখন প্রবেশ করি তখন বরদাচরণ উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেই সময় থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি। তখন থেকেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন।

সস্নেহ দৃষ্টি যে কেবল আমার উপরই ছিল একথা মোটেই অভ্রান্ত নয়। সব ছাত্রকেই তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। স্নেহই ছিল তাঁর শিক্ষার বাহন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি স্নেহে ছিলেন কুসুম কোমল। তাই বলে কর্তব্যের দিকটা তাঁর লক্ষ্যের বাইরে ছিল না। কর্তব্যে তিনি ছিলেন কুলিশ কঠোর। আদর্শ শিক্ষাবিদ্‌। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল ছাত্রের সামগ্রিক অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক সেই

সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক উন্নতি সাধন। ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে তাঁর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকত। তিনি বলতেন :—চরিত্রবলই মানুষের প্রকৃত বল। জীবনযুদ্ধে অচল, অটলভাবে দাঁড়ান নির্ভর ক'রে চরিত্র বলের উপর। নৈতিক চরিত্রের অভাব হলে মানুষের অন্তরে ঘুণ ধরে মনকে দুর্বল ক'রে দেয়। সামান্য আঘাতও তখন সইবার শক্তি থাকে না। ছাত্র জীবনই পরবর্তী সংসার জীবনের ভিত্তি। সেই ভিত্তি পাকা করতে হলে চাই সংযম, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য। চাই সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সৎসঙ্গ, কুচিন্তা পরিহার। এই গুণগুলির সাহায্যে ছাত্রজীবনকে অলংকৃত ক'রে নিতে পারলে তবেই পরবর্তী জীবনটি হবে সুবহ। নইলে দুস্তর সংসার সমুদ্রে দুর্বহ জীবন তরণী বেয়ে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।' ছাত্রদের এই সমস্ত উপদেশ দিতেন। নিজে ছিলেন নীতিবিদ্। এক সুতীক্ষ্ণ নীতি-জ্ঞান ও পৌরুষ জন্মের সাথে সাথেই নিয়ে এসেছিলেন। সামাজিক কোনও অন্যায় বা অবিচারও বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতেন না।

বরদাচরণের শিক্ষাদান পদ্ধতির গোড়ার কথা ছিল শিক্ষার্থীর রুচি ও সংস্কার উপলব্ধি ক'রে তাকে শ্রেয়াভিমুখে পরিচালিত করা। এর জন্যে প্রয়োজন হলে আত্মশক্তি প্রয়োগ করতেও বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে ঐ ভাবে ছাত্রের জীবনের মোড় উজ্জ্বলতম পথের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থবোধই ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির মূলতত্ত্ব।

ছাত্রের প্রতি গভীর স্নেহ ও সহানুভূতি না থাকলে ছাত্রের হৃদয় জয় করা দুঃসাধ্য। রক্তচক্ষু, পরুষ বচন, উদ্যত বেত্র শিশু হৃদয় জয় করতে পারে না। পারে কেবল স্নেহ, মায়া, ভালবাসা। কোন রকমের কোন ব্যবধান—আত্মাভিমান বা আভিজাত্যাভিমান অথবা জ্ঞানের গরিমা বা পাণ্ডিত্যের অভিমান যাই হোক—আচার্য এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমান থাকলে শিক্ষাদান কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিন্নাত্মা হতে পেরেছিলেন বলেই বরদাচরণ উত্তম শিক্ষক সমাজের অন্যতম হওয়ার গৌরব লাভ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃত শিক্ষক—জাত শিক্ষক রূপে গণ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার সবই তাঁর ছিল। নিজের সত্তাকে ছাত্রের আত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে—ছাত্রের স্তরে নেমে এসে তাদের মন দিয়ে সবকিছু দেখতে বুঝতে চেষ্টা করতেন। ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিটা দৃঢ় ক'রে গড়ে তোলার আগ্রহই বরাদচরণকে ছাত্রদের অত কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের হৃদয় জয় ক'রে অর্জন করতে পেরেছিলেন ছাত্রমণ্ডলীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য। প্রকৃত সদ্‌গুরুর যা গুরুদক্ষিণা।

বরদাচরণের বাহ্যরূপ ছিল—শালপ্রাংশু দেহ, অঙ্গে দেবোপম কান্তি, চোখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি, কণ্ঠে সুধা-নিস্যন্দী স্বরমাধুর্য। অনন্য ব্যক্তিত্বমণ্ডিত দেহখানি ঘিরে ফুটে উঠত একটা কমনীয় প্রশান্ত গাম্ভীর্য। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে এলে দেখা যেত ঐ ভাব-গম্ভীর আচরণের তলায় লুকিয়ে রয়েছে এক সদাপ্রফুল্ল সহাস্য বদন বালক। অনেক সময় দেখা গেছে যে ছাত্রদের সঙ্গে বালকোচিত হাসি, খুশী আনন্দ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে সহসা গম্ভীরভাবে এক জটিল প্রশ্নের অবতারণা ক'রে ছাত্রদের সমাধান করতে বলতেন। উদ্দেশ্য, তাদের সাধারণ জ্ঞানকে ক্রমোৎকর্ষের পথে নিয়ে যাওয়া। পরে নিজেই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন।

জীবনের পূর্ণতর সত্যকে জানার পথের প্রস্তুতিই শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষের জীবন গঠন করে। বিকশিত করে তার মানবতা। শিক্ষার দ্বারাই মানুষের নৈতিক চরিত্র হয় উন্নত। মানুষ হয় আত্মনির্ভরশীল।

মানববিকাশের মূল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রেই বরদাচরণ নেতিমূলক শিক্ষাকে প্রধান্য দিতেন না। সর্বাত্মক ইতিবাচক শিক্ষা নীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে

সঙ্গে ভারতের প্রাণধর্ম অধ্যাত্ম-চিন্তার সমন্বয়ে ছাত্রজীবন গঠনের প্রয়াসী ছিলেন—যা মানুষকে দিতে পারে সত্যের সন্ধান, যার দ্বারা সরল হয়ে আসে জীবন জিজ্ঞাসা। এ শিক্ষা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভাব-সাযুজ্যের মাধ্যমে, চিন্তা ভাবনার মিলনেই কেবল পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। এর নামই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই অধ্যাত্ম জীবন লাভের মূল উপাদান।

বরদাচরণের শিক্ষকতার আর একটা অঙ্গ ছিল ছাত্রদের নিয়ে একসাথে খেলাধুলো করা। ফুটবল, টাগ-অফ-ওয়ার, হাডুডু ইত্যাদি খেলা প্রায়ই হত। ফুটবল খেলায় শিক্ষক দল পরাজিতই হতেন—কিন্তু Tug-of-war এ ছাত্রদলকেই পরাজয় বরণ করতে হত। কারণ শিক্ষক দলের ঐ শালপ্রাংশু অনড় খুঁটি (Pole) সহজে নড়ান যেত না। কখন কখন পার্শ্ববর্তী গঙ্গায় ছাত্রদের নিয়ে সাঁতার দিতেন। এই আনন্দ পরিবেশ এবং অবাধ মেলামেশায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে গড়ে উঠত একটা নিগূঢ়-প্রীতির বন্ধন।

কেবল খেলাধুলোই নয়—একটা সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা ছাত্রদের ঘিরে থাকত। কোনও ছাত্রের অসুখ সংবাদ পেলে তিনি নিজে গিয়ে সমস্ত খোঁজখবর নিতেন। রোগীকে সাহস দিতেন। সান্ত্বনা দিতেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিজের পকেট থেকে অর্থ সাহায্যও করতেন। চিকিৎসার জন্যে—পথ্যের জন্যে। ক্লাসে কোনও ছাত্রের মলিন মুখ দেখলে তাকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেন। সম্ভব হলে প্রতিকার করারও চেষ্টা করতেন। একটি মুসলমান ছাত্র—আমারই সতীর্থ—অত্যন্ত গরীবের ছেলে—প্রায় ৩ মাইল দূর থেকে স্কুলে আসত। ছেলেটি খুব মেধাবী। একদিন সে ক্লাসে এসে মলিন মুখে বসে আছে। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে বরদাচরণ ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর অফিসে। বললেন ঃ—হাঁরে আজ বোধহয় খেয়ে আসিস নি ? ছেলেটি ছলছল চোখে মুখ নিচু ক'রে উত্তর দিল ঃ—"আজ খাবার হ'য়ে উঠেনি স্যার।" আর কিছু না বলে পকেট

থেকে একটা টাকা বের ক'রে ছেলেটির হাতে গুঁজে দিয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন :—"যা আগে দোকান থেকে খেয়ে আয়। পেট পুরে খাবি। তারপর ক্লাস করবি। খালি পেটে যা পড়বি কিছুই তো মনে থাকবে না।" ছেলেটি সজল চোখে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে চলে গেল।

তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে ছাত্রদের কোনও কিছুই গোপন থাকত না। ছেলেরা তা জানত। তাই সাহস করত না কোনও অন্যায় পথে পা বাড়াতে।

তাঁর শক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কয়েকটি অর্বাচীন ছাত্র, স্কুলেরই একজন নবাগত মুসলমান শিক্ষকের প্ররোচনায় বরদাচরণকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র করে। তিনি পূর্বাহ্ণেই তা বুঝতে পেরে তাদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে দেন। ছাত্র কয়টি সমস্ত স্বীকার ক'রে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। ইন্ধনদাতা শিক্ষকটির নামও সর্বসমক্ষে প্রকাশ ক'রে দেয়। ধরা পড়ে গিয়ে চরম অপদস্থ হয়ে শিক্ষকটি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।

ছাত্রের ব্যক্তিগত সম্মানকেও তিনি কোন দিন উপেক্ষা করেন নি। করতেন না। ছাত্রের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ভালভাবে জেনে অভিযোগকারী চলে গেলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি ছেলেটিকে পেতেই হত।

দরিদ্র ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক, স্কুলের মাহিনা ইত্যাদি প্রয়োজন বুঝলে নিজের পকেট থেকেও কখন কখন দিতেন। লালগোলা স্কুলে কর্মরত থাকা কালে একাধিক ছাত্রকে তাঁর বাসায় থেকে এবং খেয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন। তারা আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী তাঁর কাছে একাধারে পেয়েছিল পিতার সযত্ন অভিভাবকত্ব, মায়ের স্নেহ, তার সাথে সাথে প্রাচীন কালের গুরুগৃহের আদর্শে শিক্ষা লাভ। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক থাকাকালে দৈনন্দিন পাঠ্য বিষয় ছাড়াও অধ্যাত্ম সাধনায় যথাযোগ্য

নির্দেশ—বিশেষতঃ একাগ্রতা (Concentration) অভ্যাস করার জন্য যৌগিক ক্রিয়া শিক্ষা দিতেন। বলতেন ঃ—"ছাত্রদের একাগ্রতাই একমাত্র পারের কড়ি। সে কড়ি সংগ্রহ করতে না পারলে সারাজীবন ধরে পরীক্ষাসাগর কি করে পার হবে?" এই ভাবেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক একটি সাধকমণ্ডলী।

তের

বরদাচরণ ছিলেন পরিপূর্ণ সংসারীর সাজে সজ্জিত প্রচ্ছন্ন যোগী। গুপ্ত সাধক। নিজের সাধন জীবনের কথা সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করতেন না। সর্বপ্রযত্নে নিজেকে গোপন রাখারই চেষ্টা করতেন। কিন্তু ছাই চাপা দিলেই আগুন কি গোপন রাখা যায়? যায় না। পাতার আড়ালে ফুলটি গোপন থাকতে পারে; তার সৌরভকে আটকে রাখবে কে? ফুলটি ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক; তেমনি সাধনার পরিণতি পথে, পূর্ণতার পথেও অযাচিত এবং অনিবার্যরূপে কতকগুলি অলৌকিক বিভূতি বা যোগ-শক্তির বিকাশও সাধকজীবনে স্বাভাবিক। এগুলো সাধন পথের ক্ষণিকের অতিথি। এগুলো নিয়ে বিশেষ মত্ত হওয়া দূরাভিলাষী মনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথের অন্তরায়। এই অঘটনী শক্তিগুলো সাধকের স্বোপার্জিত নয়। এগুলো যোগবিঘ্নকর। অগ্রগতির দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু মোহময়ী এই মোহিনী শক্তির মায়াপাশ ছিঁড়ে ফেলে স্থিরলক্ষে ঋজুপদে এগিয়ে চলাও খুব কঠিন। অনেক সাধকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না বলেই মনে হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা, যশ, খ্যাতির প্রলোভন প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শক্তির আত্মপ্রকাশে মধুলোভী ভ্রমরকুলের মত স্তুতিমুখর স্তাবকদল সাধকের চারিদিকে এসে গুঞ্জন তোলে। সহস্রের মুখে নিজের নাম, যশ, খ্যাতি শুনতে শুনতে সাধকের মনে অধিকতর যশো-

লিপ্সা-স্বার্থচিন্তা-অহমিকা জেগে উঠে। এর অনিবার্য পরিণতি সাধনাচ্যুতি।

বরদাচরণও অযাচিত এবং অনিবার্যভাবেই লোকোত্তর অঘটনী শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু সে শক্তির কবলে আত্মসমর্পণ তিনি করেন নি। সে শক্তির ব্যবহার যে তিনি একেবারেই করেন নি—একথা সত্য নয়। ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। লোককে মুগ্ধ বা সম্মোহিত ক'রে দলে টানার জন্য নয়। আর্তের উদ্ধার, বিপন্নের বিপদ মুক্তি, অথবা ভগবানে অবিশ্বাসী দাম্ভিকের দম্ভচূর্ণ ক'রে তাকে ভগবৎ পথে নিয়ে আসা—এই সব লোকহিতকর প্রয়োজনেই কেবল সে শক্তির প্রয়োগ ক'রে গেছেন। সেই যোগশক্তির হাতের পুতুল তিনি হন নি।

ছাত্রসমাজকে ঘুঁটি ক'রে বর্তমান যুগের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চলেছে তেমনি প্রাক্ স্বাধীনতার অগ্নিযুগেও সাগ্নিক ঋত্বিকগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমিধরূপে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রহ করতেন। নিমতিতা স্কুলেও এই প্রকারের ঘটনা ঘটতে চলেছিল। কিন্তু বরদাচরণের অসাধারণ যোগশক্তি স্কুলটিকে ইংরাজ শাসক শক্তির কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিল। ঘটনা দুটিরই সংঘটক ছিলেন নিমতিতারই অধিবাসী শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। তিনি তখন অগ্নিযজ্ঞের প্রচ্ছন্ন সমিধ সংগ্রাহক। তাঁর রচিত "শ্রদ্ধাস্পদেষু" গ্রন্থে ঘটনা দুটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখাটিই এখানে তুলে ধরলাম।

"কাশীর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী গোপেশচন্দ্র রায় তখন ভারত সরকারের দুই হাজারী মনসবদার। তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার থেকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার। এই গোপেশচন্দ্রের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। একদিন একটি সুদর্শন কিশোর কুমারকে নিয়ে গোপেশচন্দ্র আমার বাড়িতে উপস্থিত।

ছেলেটিকে আমার হেফাজতে রেখে পরবর্তী ট্রেনে তিনি উধাও হলেন। যাবার সময় বলে গেলেন ওকে এখানকার স্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে হবে।

গোপেশচন্দ্র চলে গেলে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলে ডাকব ?"

"ধীরেন।"

ধীরেন রইল আমার বাড়িতে। পরদিন প্রাতঃকালে তাকে সঙ্গে ক'রে গেলাম আমাদের গ্রামের হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বোর্ডিং হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে কতকগুলো নির্ভেজাল মিথ্যা কথা বললাম অম্লান বদনে :—'ছেলেটি আমার নিকট আত্মীয়, অভিভাবকহীন, রংপুরে বাড়ি, এখানে পড়বার জন্য এসেছে। আপনার স্কুলে ভর্তি ক'রে নিন।"

হেড্‌মাষ্টার মশাই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কোন ক্লাসে পড়তে ?"

ছেলেটি বেশ নিরীহ, শান্তশিষ্ট, সাত চড়েও কথা কইতে জানে না ধরনের। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের সামনে তার মুখ খুলে গেল। আমার উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চমৎকার বাক্য রচনা ক'রে চলল। সে হেড্‌মাষ্টারের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, "ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম। বছর দেড়েক আগে বাবা মারা গেলেন। সেই থেকে আর স্কুলে যেতে পারি নি। পড়াশুনা একরকম বন্ধই আছে। ঘরে বসে যা সামান্য কিছু পড়েছি। আপনি যে ক্লাসের উপযোগী মনে করেন সেই ক্লাসে ভর্তি হতে আমি রাজী আছি।"

বেমালুম বলে গেল এক ঝুড়ি মিথ্যা কথা। সে কাশীতে পড়ত সেকেণ্ড ক্লাসে, আর ক্লাসের মধ্যে ছিল সেরা ছেলে। তার উদ্দেশ্য কোনও প্রকারে এখানকার স্কুলে ভর্তি হওয়া। ফোর্থ ক্লাসের ছাত্রের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে হেড্‌মাষ্টারকে এমন মুগ্ধ করবে যাতে তাঁরই গরজ বাড়ে তাকে ভর্তি ক'রে নিতে।

হেড্‌মাষ্টারমশাই বললেন, "ট্রানসফার সার্টিফিকেট এনেছ তো ?"

ছেলেটি বলল, "দেড় বছর আগে বাবা মারা গেছেন। তারও আগে ৫।৬ মাসের মাইনা বাকী পড়েছিল স্কুলে। মাইনা না দেওয়ার জন্যে নাম কাটা যায়। ট্রানসফার সার্টিফিকেট পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। আপনি একটু পরীক্ষা ক'রে দেখে ভর্তি ক'রে নিন না স্যার।"

"আচ্ছা দেখি আমি কি করতে পারি।" বলে তিনি ছেলেটিকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের কয়েকটি প্রশ্ন। ছেলেটি অবলীলাক্রমে সব কটি প্রশ্নের উত্তর দিল। হেড্‌মাষ্টারমশাই ছেলেটির মুখের উপরই তার প্রশংসা করলেন পঞ্চমুখে। পরে আমাকে বললেন, "তুমি ভাই টিফিনের সময় স্কুলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। একাই যেও।"

গেলাম তাঁর স্কুলে। একটি নির্জন কক্ষে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কে হে ? ভারী সুন্দর ছেলে ?"

আমি ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম, "ওর নাম ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দেখবেন ও আপনার স্কুলের গৌরব বাড়িয়ে দেবে।"

হেড্‌মাষ্টার মশাই একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, "তা সত্যি কথা। এইরকম ছেলেই তো দরকার। কিন্তু ভায়া ছেলেটিকে আমার স্কুলে নিতে পারছি না। এইটেই দুঃখ।"

"কেন বলুন তো"

"নতুন স্কুল, পুলিশের নজর পড়লে এ স্কুল টিক্‌বে না। দুদিনে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমি মুখে চোখে বিস্ময় মাখিয়ে বললাম, "পুলিশের নজরে ! একি বলছেন আপনি ?"

আমি অধিকতর জোরের সঙ্গে বললাম, "আপনি এমন কী দেখলেন ওর মধ্যে যে—"

কথা শেষ করতে হল না তিনি বললেন, "আমি ঠিকই দেখেছি ভায়া—এ দেখায় ভুল হয় না।"

এই হেড্‌মাষ্টারমশাইটিই বরদাচরণ মজুমদার।

অপর ঘটনাটিরও নায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মশাই। তিনি বলেছেন—"তখনকার মত বরদাচরণের কাছে মাথা হেঁট করলেও আর একটি দুঃসাহসিকের কাজ ক'রে বসলাম পরে।

আমার দুটি কাজ ছিল। বিপ্লবী দলে কর্মী সংগ্রহ করা, আর পলাতক কর্মীদের নিরাপদ স্থানে রাখা। নিমতিতা স্কুলের কয়েকটি ছাত্রকে আমি বিপ্লবীদলে টেনেছিলাম।"

বরদাচরণ এই স্কুলের দশ বারজন ছাত্রকে যোগশিক্ষা দিতেন। তাঁর এই যোগশিক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে ২।৩ জনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। স্বল্পদিনের চেষ্টাতেই তারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। এই ছাত্র কয়টি কিন্তু তাদের গুরুর কাছে কোনও দিন একথা প্রকাশ করে নি।

একদিন সকালবেলা সারা গ্রামময় সোরগোল পড়ে গেল, বোর্ডিং হাউসটি পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। প্রায় ২।৪ ঘণ্টা খানাতল্লাসী ক'রে পুলিশ সন্দেহজনক কোন কিছু পেল না বটে, কিন্তু তারা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে ধরে নিয়ে গেল বোর্ডিংএর দুটি ছাত্রকে। ছাত্র দুটিই বরদাচরণের যোগের ক্লাসের শিক্ষার্থী।

বরদাচরণ কোনও দিন এই ছাত্র দুটির চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে, আকারে-ইঙ্গিতে কোনওরূপ সন্দেহ করতে পারেন নি যে এরা পুলিশের কবলে পড়ার মত কোন কাজ করতে পারে। সেইদিন দুপুরবেলায় বরদাচরণ ডাকলেন আমায়। একটি ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমাকে বললেন :— "ভায়া, প্রথমেই কথা দিচ্ছি আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। তুমি শুধু আমাকে বলে দাও আমার স্কুলে তোমাদের দলের আর কয়টি ছেলে আছে। আমি তাদের ট্রানসফার সার্টিফিকেট

দিয়ে খুব গোপনে একে একে বিদায় ক'রে দেব। তারা যে সৎ স্বভাবের ছাত্র এ কথারও উল্লেখ থাকবে।"

বরদাচরণের কথা আমি স্রেফ উড়িয়ে দিলাম। বললাম, "কি বলছেন আপনি? আমার আবার দল কি মশাই। আমার কোনও দলটল নাই বা আমিও কোনও দলের নই।"

তিনি বহু প্রকারে চেষ্টা করলেন আমার কাছ থেকে তাঁর স্কুলের বিপ্লবী ছাত্রগুলির নাম সংগ্রহ করবার জন্য। কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হ'লেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল আমাদের যে কয়টি ছাত্র স্কুলে ছিল সবগুলিকে বেছে বেছে তিনি ট্রানসফার সার্টিফিকেট দিয়ে বিদায় করলেন।

চৌদ্দ

দাম্ভিক, যোগশক্তিতে ঘোর অবিশ্বাসী অহং সর্বস্ব এক ভদ্রলোকের দম্ভচূর্ণ করার ঘটনা নিমতিতা জমিদার ভবনেই ঘটেছিল। বরদাচরণ তখন নিমতিতা স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। সে নাটকীয় ঘটনার নাট্য লোকে প্রবেশের আগে বিষ্কম্ভক স্বরূপ পাত্রপাত্রীগণের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

নিমতিতার জমিদার দ্বারিকানাথ চৌধুরীর দুই পুত্র। মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ কনিষ্ঠ। ১২৮৫ সালে মহেন্দ্রনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মত নাট্যামোদী, নাট্য-রসিক ও নাট্যমঞ্চের হিতৈষী বন্ধু বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিজে তিনি নাট্যকার ছিলেন না সত্য, তবু নাট্য রচনা বিষয়ে তাঁর রসবোধ এবং শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যরচনা বিষয়ে মহেন্দ্রনারায়ণের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানিই একথার প্রমাণ। তাঁর সর্বশেষ নাটক "নর-নারায়ণ" সম্বন্ধে ১৭।১০।২৪ তারিখে চিঠিখানি তিনি মহেন্দ্রনারায়ণকে লিখেছিলেন। "প্রিয় মহেন্দ্র ভাই।······ তোমার কথামত সেই দৃশ্যগুলো লিখতে আরম্ভ করেছি। তৃতীয় অঙ্ক সত্বর শেষ করে পাঠাচ্ছি।······আমার পুস্তক কেহ না লয় তুমি কাছে রাখিও। তোমার ষ্টেজে (বাড়ির) নিশ্চয়ই উপাদেয় হইবে।"

(নর-নারায়ণের ভূমিকায় নাট্যকারের পুত্র সতীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত)। সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রায় প্রতি বৎসরই মহেন্দ্রনারায়ণের হিন্দু থিয়েটর মঞ্চে অভিনয় দেখতে আসতেন। একবার "আলমগীরের" ভূমিকায় নিজেও নেমেছেন। তিনিও স্বীকার ক'রে গেছেন যে মহেন্দ্রনারায়ণ তাঁর চাইতেও উচ্চ স্তরের গুণী, কেননা তিনি একাধারে কুশলী নট, নাট্যশিক্ষক, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালক। শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির' রঙ্গালয়টি মহেন্দ্র-নারায়ণের অকৃপণ পোষকতায় বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। ১৩৩২ সালের ২৬শে মাঘ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে সেদিনের দুশ্চিকিৎস্য 'ডিপথিরিয়া' রোগে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন। অভিনয়কে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনারূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাধনপীঠকেও বিপুল অর্থব্যয়ে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের মত গড়ে তুলেছিলেন।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সুধী সমাজে সুপরিচিত। এককালের কলকাতা জেনারেল এসেমব্লী কলেজের (বর্তমান স্কটিশ চার্চ) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও তিনি একাধারে স্বনামখ্যাত নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, কবি এবং সুবক্তা ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে নাট্যকার এবং সাহিত্যিক রূপে নবজন্ম গ্রহণ করার পর মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হৃদ্যতায় পরিণত হয়। বৎসরের বহুলাংশ তিনি পরম সমাদরে নিমতিতা ভবনেই বাস করতেন। এখানে বসেই কয়েকখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। তাঁর রচিত 'রামানুজ' নাটকখানি সর্বপ্রথম নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় করতে দিয়ে তিনি মহেন্দ্রনারায়ণকে সম্মানিত করেন।

বরদাচরণের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। তিনি 'ক্ষীরোদদা' বলে ডাকতেন। বরদাচরণের যোগশক্তি সম্বন্ধে ক্ষীরোদপ্রসাদ অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে বরদাচরণকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অনেক উচ্চে স্থান দিতেন।

নিমতিতা ভবনে দোল দুর্গোৎসবাদি বিশেষ উৎসবগুলি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সেই উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, মেলা ইত্যাদি হত। কলকাতার নাট্যজগতের বিশিষ্ট শিল্পী এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। পরিতাপের বিষয় সে সব আনন্দ উৎসবাদি এখন স্মৃতির অতলান্ত গর্ভে। ইতিকথায় পরিণত।

এবারে নাট্যালোকে প্রবেশের পালা।

ওই উপলক্ষে একবার কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও মহেন্দ্রনারায়ণের কয়েকজন বন্ধু। তাঁদের মধ্যে একজন ডাক্তারও রয়েছেন।

জমিদার বাড়ির দোতলার প্রশস্ত ড্রয়িংরুম। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ, স্থানীয় প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুগণ ও বরদারচরণ সহ মহেন্দ্রনারায়ণ নানারকম আমোদজনক আলাপ আলোচনা করছেন। আলোচনা স্বাভাবিক গতিতেই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এল ধর্মতত্ত্ব— ঈশ্বরতত্ত্ব। শেষে এসে পড়ল অধ্যাত্মতত্ত্ব। অতিথিদের মধ্যে কেবল দুজন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। অপর সকলে নীরব শ্রোতা। আলাপের গতি ক্রমশঃ তর্কযুদ্ধে পরিণত হল। অংশগ্রহণ করলেন একপক্ষে একক ক্ষীরোদ-প্রসাদ অপর পক্ষে মহেন্দ্রনারায়ণের পূর্বোক্ত চিকিৎসক বন্ধু এবং কলকাতার এক সাধারণ রঙ্গালয়ের খ্যাতনামা নট। চিকিৎসক বন্ধু ক্ষীরোদপ্রসাদের কথার প্রতিবাদে বলছেন—"ও যোগযাগ সব মিথ্যা। সবই বাজে। ওসব আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। সমাধিটা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে বলা হয় স্নায়বিক বিকলতার দরুন অবসাদগ্রস্ত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নটবন্ধু বিদ্রূপাত্মক হাসি মুখে বললেন, "ও সব বুজরুকী।"

এই সব উক্তিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের স্পর্শকাতর মনটি উত্তেজিত

হয়ে উঠেছে। গম্ভীরভাবে তাঁদের বললেন—"দেখুন এমন একজন এখানে রয়েছেন যিনি তাঁর যোগশক্তিতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই দেখতে পান। বলতেও পারেন।"

নটবন্ধু ব্যঙ্গচ্ছলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বললেন—"আরে মশাই বর্তমান তো আমরাও যোগযাগ না ক'রেও দেখতে পাচ্ছি। তবে অতীত আর ভবিষ্যৎটা দেখার যদি কেউ সত্যি এখানে থাকেন দয়া ক'রে আমার ভবিষ্যৎটা বলতে বলুন না। দেখি আমিও যোগী-টোগী হতে পারি কিনা। আগে অতীতটাই বলতে বলুন কারণ ওটা আমার জানা। ওখানে ধাপ্পা চলবে না।" ক্ষীরোদপ্রসাদের উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছে। গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলটি অরুণাভ হয়ে উঠেছে। সহসা তিনি বরদাচরণের কাছে এসে তাঁর হাতখানি জড়িয়ে ধরেছেন—"ভাই বরদা! শুনলে তো সবই। বৃদ্ধ দাদার সম্মান রক্ষা কর। ওঁর অতীতের যাহোক দুএকটা কথা বল।"

বরদাচরণ সব ক্ষেত্রে যোগশক্তি প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু এক্ষেত্রে নীরব নির্লিপ্ত থাকতে তিনিও পারেন নি। তাঁর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল যে দাম্ভিকের দম্ভ, উপহাস, ব্যঙ্গোক্তি তাঁর অন্তরেও গভীরভাবে দাগ কেটেছে। কুতার্কিক দুজনের বিদ্রূপের মাত্রাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদ বরদাচরণকে বললেন, "বরদা, আমি তোমার শক্তি জানি। এও জানি তুমি সব সময় সবখানে সে শক্তির প্রকাশ করতে চাও না। তবু অনুরোধ করছি। এতে তোমার বৃদ্ধ দাদারই কেবল নয়, আমাদের পূর্বপুরুষ মুনি ঋষিদেরও সম্মান, মর্যাদা রক্ষিত হবে।"

অতঃপর প্রতিভাবান্ স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনীষী বৃদ্ধের অনুরোধ বরদাচরণ অস্বীকার করতে পারলেন না। সম্মত হলেন।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করলেন। মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল একটা অলৌকিক দিব্যদ্যুতি। অন্তর সন্ধানী স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই দাম্ভিক, কুতার্কিকের চোখ দুটির উপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে

চোখ দুটি বন্ধ ক'রে ধ্যানের গভীরে তলিয়ে গেলেন। কুতার্কিক বন্ধুদ্বয় বরদাচরণের সেই ধ্যানস্তব্ধ চেহারা দেখে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেছে। তাদের মুখের উপর ফুটে উঠেছে একটা অজানা আতঙ্কের কালো ছায়া।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। যোগীরাজ ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। চোখ দুটি দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তীব্র জ্যোতি। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সেই নটকে—

"দেখুন আজ থেকে মাস খানেক আগের কথা। টাটকা, কাজেই ভুলে নিশ্চয়ই যান নি। আপনি—স্টেজের পাশের একটা নির্জন ঘরে এক তরুণী অভিনেত্রীকে তার ভূমিকাটি শেখাছিলেন। অভিনেত্রীটির অঙ্গগঠন, তার বয়স, হাবভাব ইত্যাদির যথাযথ বর্ণনা একেবারে নিখুঁতভাবে দিয়ে তার পর বলছেন: "সেই নির্জন ঘরে আপনারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। আপনার ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরবর্তী ঘটনাটা এখানে সবার সামনে বলব কি? যদি পরীক্ষা করতে চান বলুন সেটাও প্রকাশ করি?" বরদাচরণের মুখখানি আরক্তিম। চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে।

বরদাচরণের যোগদৃষ্টির আলোতে সেই দাম্ভিক এবং কুতার্কিক নটের কদর্য চরিত্রের নগ্ন স্বরূপটি বিদগ্ধ এবং অভিজাত অতিথিগণের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ায় তার সেই বিদ্রূপের হাসিভরা মুখ তখন পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। মুখ তুলতে পারছে না।

এদিকে ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন জয়ের উল্লাসে উল্লসিত। শিশুর মতন বরদাচরণকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলছেন—"ভাই বরদা! আজ পরাজয়ের গ্লানি থেকে আমাকে—না, কেবল আমাকেই কেন—আমাদের যোগাচার্য ব্রহ্মবিদ্ ঋষি পতঞ্জলীরও মর্যাদা রক্ষা করলে। এইবার অবিশ্বাসী ডাক্তারবাবুকে একটু বুঝিয়ে দাও যে যোগযাগ মিথ্যা নয়। বাজে নয়। বুজরুকী বা ধাপ্পাও নয়। আর বুঝিয়ে দাও যে তাঁদের মেডিকেল সায়েন্স যা বলেন সেটাও অভ্রান্ত নয়।"

তখন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চরমতম দুর্দশা দেখে ডাক্তারবাবু আতঙ্কিত। হাত দুটি জোড় ক'রে বরদাচরণকে অনুরোধ করছেন—"আমার কোনও কথা বলার প্রয়োজন নাই। নিজের ভুল আমি বুঝেছি। বরদাচরণের মুখে অমলিন হাসি। ডাক্তারবাবুকে বললেন—"আপনাকে একটা কথাই শুধু মনে রাখতে অনুরোধ করব। মহাকবি সেক্সপীয়রের কথাটা মনে রাখবেন—There are more things in heaven and earth than your philosophy could dream of—"

দীর্ঘদেহী প্রৌঢ়ের তখন কী উল্লাস। বলছেন, "কেমন! আমি বলেছিলাম না যে এখানে একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন?"

পনের

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে বরদাচরণের প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার কথা আগেই বলা হয়েছে। অবসর মত দুজনে সাহিত্য, দর্শন, যোগ-তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হত। থিয়েটারের মহড়ায় ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায়ই মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। বরদাচরণকেও নিয়ে যেতেন।

একদিন ক্ষীরোদপ্রসাদেরই 'প্রমোদরঞ্জন' নাটিকা খানির মহড়া চলছে। সঙ্গীত শিক্ষক নর্তক বালকদের একখানা গানের সুর শেখাচ্ছেন। গানখানি :—

"আমার মনটি করিয়া চুরি
আমার প্রাণটি করিয়া চুরি
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে
এত দিনে এলে ফিরি। (সখা)"

মহেন্দ্রনারায়ণ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ দুজনেই গানখানার সুর ও অভিনেয় রূপটি যাতে মনগ্রাহী এবং নিখুঁত হয় সে দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। বরদাচরণ তন্ময় হয়ে গানখানি শুনছেন। বিরতির অবকাশে ক্ষীরোদপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ক্ষীরোদদা! আপনার এ গানখানির অর্থ কি?"

ক্ষীরোদপ্রসাদই নাট্যকার। গানখানার রচয়িতাও তিনি। নাট্য প্রসঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর মধ্যে দিয়ে যে ভাব তিনি ফোটাতে চেয়েছেন তাই বিশদভাবে বললেন।

বরদাচরণ মৃদু হেসে বললেন—"আমার মনে এর আরও একটা ভাব উঁকি দিচ্ছে ক্ষীরোদদা ?"

শিশুর মত আগ্রহ নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ সে ভাবটি জানতে চাইলেন।

বরদাচরণ ক্ষীরোদপ্রসাদের চোখে চোখ রেখে বললেন—"কৃষ্ণহারা রাধিকা শতবর্ষ পরে একদিন তাঁর অন্তর মন্দিরে সেই বাঁশীর কিশোরকে চিরদিনের মত ফিরে পেলেন। আর হারাবার পালাবার ভয় নাই। ভাব সম্মিলিতা শ্রীরাধার সেই সময়ের মনের ভাষা কি এই হ'তে পারে না ? সাধকের ক্ষেত্রেও তাই।"

অপূর্ব ভক্তি রসাত্মক ব্যাখ্যা শুনে ক্ষীরোদপ্রসাদ আনন্দে বরদাচরণকে জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বলে উঠলেন—"বরদা ভাই ! আমার লেখা গানের এ অর্থও হয় ?"

ভক্ত বৃদ্ধের দুচোখ বেয়ে নেমে আসছে আনন্দধারা।

নানা গল্পচ্ছলে বরদাচরণ নিজেই এ কাহিনী একদিন আমাদের বলেছিলেন।

ষোল

গরমের ছুটি। স্কুল বন্ধ। বরদাচরণ নিজ বাড়ি কাঞ্চনতলায় অবসর যাপন করছেন। ভয়ানক গরম। বৃষ্টির নামগন্ধও নাই। একদিন বিকালবেলা বাড়ির ঠিক সামনের প্রতিবেশী বাল্যবন্ধুর বাড়ির সামনে খোলা উঠানে ঘাসের উপর বাল্যসঙ্গী ও সতীর্থদের নিয়ে সান্ধ্য আসর বসেছে। নানা খোশগল্পে সময় কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী সেখানে এলেন। তাঁকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি হাতছানি দিয়ে বরদাচরণকে ডাকলেন। তিনি উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী বললেন—"কিছু কথা আছে, একটু নির্জনতার প্রয়োজন।" বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে সন্ন্যাসীকে নিয়ে নিজ বৈঠকখানায় গেলেন। বরদাচরণ সামনের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

অপেক্ষমান বন্ধুদের মনের পটে তখন ফুটে উঠেছে দূর অতীতের একখানা ছবি। মনে পড়ে গেছে বটতলায় সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। বরদাচরণের সঙ্গে গোপন কথা। এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনাও চলছে। জানার আগ্রহ নিয়ে তারা প্রতীক্ষা করছে তাঁদের বাইরে আসার।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুলে গেল। দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। বরদাচরণ বন্ধুদের বললেন সাধুজী কোন কিছুই আহার করবেন না। রাত্রির মত বিশ্রাম করতে পারেন। তবে লোকালয়ের বাইরে কোন জায়গা পেলে।

সন্ন্যাসীর অভিমত জেনে সকলে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন হাইস্কুলের ছাদে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। সেই মত বরদাচরণের বাপের আমলের চাকর ভগবানদাসকে লণ্ঠন আর মাদুর সঙ্গে দিয়ে তাঁকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন।

কাঞ্চনতলা হাইস্কুলটি সে সময় লোকালয়ের বাইরেই ছিল। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের ধুলিয়ান স্টেশনের পাশেই। কাঞ্চনতলা থেকে লাইন পর্যন্ত বড় রাস্তা। স্কুলের কাছাকাছি পর্যন্ত রাস্তার ধারে ঘন আমবাগান। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গা থেকে আর একটা রাস্তা সোজা পশ্চিম মুখে চলে গেছে। এই সংযোগ স্থলে একটা বহুকালের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির।

[এ চিত্র অবশ্য অর্ধশতাব্দীরও পূর্বেকার। পদ্মার ভাঙনে ধুলিয়ানের বিশাল ব্যবসাকেন্দ্র সেই সঙ্গে রেল লাইন ও স্টেশন সমস্তই নিশ্চিহ্ন। এখন উপরোক্ত বড় রাস্তার দুই পাশ জুড়ে ধুলিয়ান বাজার ও জনপদ।]

রাত খুব গভীর নয়। তবে কৃষ্ণপক্ষ তাই অন্ধকার। রাস্তাও নির্জন। লোকচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। লণ্ঠন আর মাদুর নিয়ে ভগবানদাস আগে আগে চলেছে। সন্ন্যাসী তার পিছনে। পায়ে তাঁর খড়ম। কালীমন্দিরের কাছে তারা এসে পড়েছে। হঠাৎ ভগবানদাসের খেয়াল হল—কৈ খড়মের আওয়াজ তো কানে আসছে না! পিছন ফিরে সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেল না। এ জায়গার পরিবেশটা ভীতিজনকই ছিল সেদিন। দুই পাশেই ঘন সন্নিবিষ্ট আমগাছ ও সেই সঙ্গে পথের নির্জনতা রাতের আঁধারকে যেন আরও গভীরতর করে তুলছে। তার উপর ঐ কালীমন্দির সম্বন্ধে সেদিনের সাধারণ লোকের একটা ভীতিজনক সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। তবুও ভগবানদাস সাহসে ভর করে এদিক ওদিক দেখল। নাঃ—সন্ন্যাসীর কোনও সন্ধান নাই। তখন সে বেশ ভয় পেয়ে—সন্ন্যাসীর সন্ধানে বিরত হয়ে দ্রুত পদে বাড়ি ফিরে গেল।

বন্ধুরা সকলে এবং বরদাচরণও সেইখানেই তখনও বসে ছিলেন ভগবানদাস সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। সকলেই ভয়ানক বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু বরদাচরণের চোখে মুখে যেন ফুটে উঠছে একটা মৃদু অস্পষ্ট রহস্যময় হাসির রেখা।

সতের

১৯২০ সালের প্রথম দিক।

কানাঘুষায় কানে এল আমাদের প্রধান শিক্ষক নিমতিতা স্কুল থেকে চলে যাচ্ছেন। লালগোলার রাজা বাহাদুর তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার তাঁকে নিতে হবে। ১৯১৫ সালে যখন বরদাচরণ কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণের গার্জন টিউটরের পদ ছেড়ে নিমতিতা হাইস্কুলে চলে আসেন সেই সময়েই নাকি রাজাবাহাদুর এই প্রস্তাব করেছিলেন। বরদাচরণও তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে ছিলেন। বলেছিলেন "সময় হলেই জানাবেন, নিশ্চয়ই আসব।"

এক বছরের বিনা বেতনে ছুটির দরখাস্ত করেছেন জানা গেল। অনেক ছাত্রেরই মন ভেঙে গেল। অনেকে বিশেষত যোগ শিক্ষার্থী ছেলেরা ট্রানসফার সার্টিফিকেট নিয়ে লালগোলা স্কুলে যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হল।

জানা গেল নিমতিতা স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৯২০ সালের ১লা জুন থেকে এক বছরের বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করেছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক কালীপদ মিশ্র মহাশয়ের হাতে দায়িত্ব ভার দিয়ে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। কালীপদ মিশ্র অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ চালাতে লাগলেন। বরদাচরণ আর ফিরে আসেন নি।

কালীপদ মিশ্রের সঙ্গে বরদাচরণের গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল।

কালিবাবুও ছিলেন শিবভক্ত। দক্ষিণ খণ্ডের (বর্ধমান) স্বনামখ্যাত সাধক তপস্বী দ্বারিকানাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। যোগাভ্যাস করতেন। বরদাচরণের সঙ্গে তাঁকে ধর্মতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করতে দেখা গেছে।

মহাপ্রাণ কালীপদ মিশ্রের জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়া নামক গ্রামে। তাঁর জীবনের একটা বৃহত্তম অংশ তিনি নিমতিতাতেই অতিবাহিত ক'রে গেছেন। তিনিও অত্যন্ত ছাত্রবৎসল ছিলেন। বরদাচরণের মতই নিজের উপার্জিত অর্থের বহুলাংশ দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি। সাংসারিক বিষয়ে যাবতীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাপন ক'রে গেছেন। কিন্তু স্বরূপত বরদাচরণের মতই তিনিও ছিলেন অনাসক্ত কর্মযোগী—নির্লিপ্ত সংসারী।

বরদাচরণকে এই ছুটির মধ্যেই অনেকগুলো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল।

শরিকানী সম্পত্তি অশান্তি সৃষ্টি করে। এটাই খুব স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম হয় না তা নয় তবে তা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। বরদাচরণকেও কিছু কিছু অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই ছুটিতেই সে সবের সুষ্ঠু সমাধান করেন। পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়ে আসে। আর একটা বড় কাজ এই অবসরেই ক'রে ফেলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। লালগোলা স্কুলে যোগদানের কিছু পরেই সে দায় থেকে তিনি মুক্ত হন।

আঠার

১৯২১ সাল।

লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমী। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীহরিচরণ চৌধুরী মহাশয় চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বরদাচরণ এসে তাঁকে দায়িত্ব ভার থেকে মুক্ত করলেন।

মহেশনারায়ণ একাডেমী রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সি. আই. ই. কর্তৃক ১৯১৪ সালের ৮ই জানুয়ারী স্থাপিত। সেদিনও যোগীন্দ্রনারায়ণ 'মহারাজা' উপাধি পান নি। এ বংশের পূর্বপুরুষরা মুর্শিদাবাদ নবাবী আমলের অতিসম্ভ্রান্ত বর্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন। 'রাও' উপাধি তাঁদের বংশানুক্রমিক। নবাব দপ্তর থেকে পাওয়া।

এক শতাব্দীরও আগের কথা। লাগগোলার জমিদার রাও মহেশনারায়ণ রায়, তীর্থ পর্যটনে বাহির হন। সঙ্গে নেন তাঁর স্বজাতি, বন্ধু,—কর্মচারীও বটেন—গাজীপুর জেলার পল্লিগ্রামের রামসমঝাওনকে। তীর্থ পরিক্রমার পর ফেরার পথে কাশীধামে মহেশনারায়ণ জীবন সংশয় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ইতিপূর্বে কোনও পোষ্য বা দত্তকও গ্রহণ করেন নি। যখন বুঝলেন যে জীবনের আশা আর নাই। পরামর্শ করারও আর কেউ কাছে নাই, তখন তাঁর তীর্থসঙ্গী বন্ধু রামসমঝাওনের সঙ্গেই পরামর্শ ক'রে তার আট বছর বয়সের বালক পুত্র রামচরিতকে

আনিয়ে বিধিসম্মতভাবে দত্তক গ্রহণ করেন। রামচরিত যোগীন্দ্র-নারায়ণে নামান্তরিত হন। ভাগ্যলক্ষ্মী গোচারণরত রাখাল বালককে তার গোষ্ঠাঙ্গন থেকে কোলে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

আঠারো বছর বয়সে রাজকীয় আড়ম্বরে যোগীন্দ্রনারায়ণের বিবাহ সম্পন্ন হল। কয়েকটি বছর দাম্পত্য সুখেই অতিবাহিত হল।

মানুষের জীবন কখনও নিরবছিন্ন সুখ অথবা দুঃখময় হয় না। অন্তহীন কালপ্রবাহে সম্ভোগ এবং দুর্ভোগ দুই কূল ছুঁয়ে তার রস আস্বাদন করতে করতেই জীবন তরণী লক্ষ্যের পানে এগিয়ে চলে। যোগীন্দ্রনারায়ণের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ভাগ্যের নিদারুণ কশাঘাত সহসা একদিন পত্নী বিয়োগের রূপ নিয়ে নেমে এল তাঁর জীবনে। জীবন সঙ্গিনীর আকস্মিক তিরোধানে মুহ্যমান হয়ে শান্তির আশায় তিনিও বেরিয়ে পড়লেন তীর্থের পথে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সমস্ত তীর্থগুলো ঘুরিয়ে এনে তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী আবার তাঁকে বসিয়ে দিলেন তাঁর রাজাসনে। ফিরে আসার পর আবার বিবাহ করেন। এবারে কয়েকটি পুত্রকন্যাও লাভ করেন।

১২২৪ সালে যোগীন্দ্রনারায়ণ মহারাজা উপাধিলাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার জন্য এই বিদ্যায়তনটি তিনি নির্মাণ ক'রে দেন। আর স্কুলটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সরকারের হাতে লক্ষাধিক টাকা এককালীন জমা দেন।

যোগীন্দ্রনারায়ণের আগ্রহাতিশয্যেই বরদাচরণ এই স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট একটা বাড়িতে তিনি সপরিবারে বাস করতে থাকেন।

যোগীন্দ্রনারায়ণ বরদাচরণকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যে কোন বিষয়ে তাঁর যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। প্রায়ই ডেকে নিয়ে স্কুল সম্বন্ধে—নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে এবং কখনও কখনও ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন।

লালগোলা আসার পর বরদাচরণের নিজস্ব আত্মসাধনা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। একনিষ্ঠ সাধনায় জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধনার পদ্মদলগুলি একের পর এক খুলতে থাকে। এখানে এসে তিনি সাধক, যোগীরূপে আখ্যাত হন। যোগজীবনের অঘটনী প্রতিভার, অলৌকিক যোগশক্তি বা বিভূতিগুলো একে একে বিকশিত হতে আরম্ভ করে। মধুর গন্ধে মৌমাছির মত দেশ, বিদেশ এমন কি বহির্ভারত থেকেও দলে দলে দর্শনার্থীরা আসতে থাকেন। তিনিও যথাসাধ্য সকলের সঙ্গেই দেখা করতেন। তৃষিতদের নতুন জীবনপথের সন্ধানও দিতেন। লালগোলাকে কেন্দ্র ক'রে এক নূতন শিক্ষাপ্রচারে তিনি ব্রতী হন। এক অব্যক্ত, অজ্ঞাত, বিস্ময়কর অলৌকিক রাজ্যের কাহিনী শিক্ষার্থীদের শোনাতেন। শিক্ষা মন্দিরের বাহিরেও বহু নরনারী তাঁকে আচার্যরূপে—গুরুরূপে বরণ ক'রে নিয়েছিল।

উনিশ

সাধনলব্ধ অলৌকিক বিভূতি বা শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে বরদাচরণ অত্যন্ত সংযত ছিলেন ; একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। তবু ক্ষেত্র বিশেষে এ শক্তির প্রকাশ হয়ে পড়ত। একথাও পুনরাবৃত্তি মাত্র।

একদিন পূর্ববঙ্গের এক জেলা শহরের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বরদচারণের বাসায় এলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, একটি রুগ্ন শিশুপুত্র ও একজন আরদালী। বললেন—তাঁদের বাসায় কিছুদিন থেকে নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপদ্রব চলছে। মাঝে মাঝে কোনও অজ্ঞাত স্থান থেকে কচিছেলের কান্না কানে ভেসে আসে। ভয়ে কারও ঘুম হয় না। এঁদের ছেলেটিও দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির সব রকম চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিকারের সম্ভাব্য সব রকম উপায় ক'রেও সে উপদ্রব থামছে না। বরদাচরণের সম্বন্ধে শুনে তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন।

যোগীরাজ সমস্তই মন দিয়ে শুনলেন। তার পর ধ্যানস্থ হলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সহসা চোখ মেলে তাকালেন। ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে বললেন—"পাকা রাস্তার ধারেই আপনার বাসাটা। তাই না ?

ভদ্রলোক—আজ্ঞে হাঁ, রাস্তার উপরই বটে।

বরদা—বাসার সদর দরজাটা দক্ষিণমুখী। তার ঠিক সামনে রাস্তার অপর পাশে একটা বেল গাছ আছে। কেমন ?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ, সবই ঠিক মিল্‌ছে। আপনি কি ওখানে গিয়ে ছিলেন? ও-বাসাটা দেখেছেন তাহলে?

বরদাচরণ—আমি ঐ শহরেই কোনও দিন যাই নি।

ভদ্রলোক—তাহলে এমন হুবহু ছবিটা দিচ্ছেন কি ক'রে?

বরদাচরণ—সেটা জানার জন্যে তো আসেন নি। যেটা জানবার সেটাই আগে জানুন। 'কেমন করেটা', আগ্রহ থাকলে পরে জানবেন। তারপর শুনুন—আপনার বাসায় চার খানি ঘর কেমন?

কর্মচারী ভদ্রলোক বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্। তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন—হ্যাঁ বাবা! আপনি যা বলেছেন তাই সত্য। ঘর চারখানি।

বরদাচরণ—আপনাদের শোবার ঘরখানাই সব চাইতে বড়। আর সেই ঘরে দেওয়ালে একটা ছোট গা আলমারী আছে?

মহিলা—হ্যাঁ আছে।

বরদাচরণ—এইবারে শুনুন উপদ্রবের হেতু আর তার প্রতিকার। ঐ আলমারির নিচের দিকের কয়েকখানি ইট খুলে ফেললে দেখবেন একটা চোরাগর্ত। সেখানে একটা শিশুর কঙ্কাল শোয়ান রয়েছে। ওটা তুলে সম্ভব হলে গঙ্গা অথবা কোন নদীতে জলশায়ী ক'রে দিবেন। ঐ গর্ত মেরামত ক'রে সেখানে শিবপূজা করাবেন। পূজার নির্মাল্য ধোয়া জল দিয়ে শিশুটিকে স্নান করাবেন। চারটি বেল পাতায় এই মন্ত্র (বলে দিলেন) বেলের কাঁটার সাহায্যে রক্ত চন্দন দিয়ে লিখে আপনার বাসার বাহিরের চারকোণে পুঁতে দিবেন। আপনারা উভয়েই এই মন্ত্র দুইবেলা ১০৮বার ক'রে জপ করবেন। সামনের বেল গাছের গোড়টা ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিবেন। ভয় নাই ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

সরকারী কর্মচারীটি ফিরে গেলেন। দিন দশ বারো পর তাঁর একখানা চিঠি এল। জানিয়েছেন যে বরদাচরণ যা যা বলছেন অবিকল সে সব মিলে গেছে। কঙ্কাল সত্যই ছিল। তা জলশায়ী এবং তাঁর নির্দেশ মত সমস্তই করা হয়েছে। ছেলেটি যেন ভালর দিকেই যাচ্ছে। ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তাঁরা আবার আসবেন।

কুড়ি

দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ এক পরিব্রাজক। পরনে গেরুয়া কাপড়। গায়ের রং তামাটে। হাতে বড় বাঁশের লাঠি। বরদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন বাসায়। বেলা তখন ১১টা। বরদাচরণ স্কুলে। পরিব্রাজকের স্নানাহার শেষ হল। বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হল।

বাসাটার পাশেই একটা বড় পুকুর। তার পাড়ে রাস্তার ধারেই একটা বেল আর একটা তমালগাছ পাশাপাশি ছিল। নিজের খরচেই—বরদাচরণ গাছ দুটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁধিয়ে একটা প্রশস্ত চাতাল তৈরী করেছিলেন। পাশেই একটা যজ্ঞকুণ্ড। সন্ন্যাসীদের সুবিধার জন্য। বহু সাধু সন্ন্যাসী এসে ঐ তমাল তলায় দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতেন। অনেক পথচারীও ঐ ছায়া শীতল বেদীতে বিশ্রাম করত। তিনি নিজে রোজ বিকেলে ঐ বেদীতে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

সেদিন সন্ধ্যাতেও যথারীতি আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তমাল তলায়। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক, কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন। পরিব্রাজক মহাশয়ও। আলোচনা ভগবৎ প্রসঙ্গেই এগিয়ে চলেছে।

সহসা কি একটা কথা প্রসঙ্গে—আজ এতদিন পরে মনে নেই—পরিব্রাজক বরদাচরণের কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

বরদাচরণ মৌখিক প্রতিবাদ কিছুই করলেন না। অন্তর-সন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিব্রাজকের চোখদুটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে— চোখ বন্ধ ক'রে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। চোখ মেলে তাকিয়ে দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, "আপনার স্বরূপ আপনি তো ভালভাবেই জানেন। আমাকে তা প্রকাশ করতে বাধ্য করবেন না।"

দুর্বল স্থানে আঘাত লাগায়—পরিব্রাজক মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে ফেলল, "ওসব বুজরুকী আমার ঢের দেখা আছে। অনেক অনেক যোগী সন্ন্যাসী আমি চরিয়ে এলাম। কী ভয় আপনি দেখাচ্ছেন আমাকে? আমার সম্বন্ধে কী আপনি জানেন? কতটুকু জানেন?"

বরদাচরণ শান্ত গম্ভীর সুরে বললেন—"আপনি যোগী সন্ন্যাসীই চরিয়ে আসুন আর লোকের চোখকেই ফাঁকি দেন—আপনার এই ছদ্মবেশের আড়ালে লুকানো দুষ্কৃতি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। বলুন, আপনার মুখোসটা খুলে দেব? কী অপরাধ করেছিল আপনার নিরপরাধা স্ত্রী?

সহসা যেন জোঁকের মুখে চুন পড়ে গেল। একেবারে চুপ্‌সে গেলেন প্রতিবাদ মুখর পরিব্রাজক। বিদায়কালে পাংশুমুখে বরদাচরণের হাত দুটি ধরে বার বার ক্ষমা চেয়ে গেলেন।

একুশ

হৃদয়নাথ সরকার। এক জমিদারী এস্টেটের একজন বহুদর্শী প্রবীণ ম্যানেজার। ধার্মিক, সৎস্বভাবের প্রৌঢ়। বৃদ্ধ, প্রজাবৎসল, ধার্মিক জমিদার অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করলেন। তাঁর একমাত্র যুবক পুত্র এস্টেটের সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন।

প্রদীপের নিচেই অন্ধকার থাকে। তাই পিতার সৎগুণগুলোর ছিটেফোঁটাও তিনি পান নি। হঠাৎ বিপুল সম্পত্তির মালিকানা সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অদম্য কামানলে ইন্ধন জোগাল। হয়ে উঠলেন দুর্দমনীয় উচ্ছৃঙ্খল। আনুষঙ্গিক দোষগুলিও এসে পড়তে দেরি হল না। অহেতুক প্রজানিপীড়ন হয়ে উঠল তাঁর বিলাস।

হৃদয়নাথ ছিলেন বৃদ্ধ জমিদারের মতই প্রজাবৎসল, হৃদয়বান। বর্তমান মালিকের আচার ব্যবহার কর্মধারার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। মনোমালিন্য ক্রমে বাড়তে থাকল। নির্বিবাদী হৃদয়নাথ অবসর গ্রহণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অত্যাচার উৎপীড়নে প্রজাসাধারণ তখন হয়ে উঠেছে উত্ত্যক্ত। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে তারা সব সয়ে যাচ্ছে। গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে প্রতিকারের পথ জানতে চাইছে। তাদের ধৈর্য তখন সহনশীলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। জনকয়েক শিক্ষিত ভদ্র প্রজা তাঁকে বললেন, "ম্যানেজারবাবু! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপনি এস্টেটের সঙ্গে জড়িত

থাকতে সেটা সম্ভবপর হচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি হয় আপনি চলে যান।" তিনি এ পরামর্শ মেনে নিলেন।

ম্যানেজার কাজ ছেড়ে চলে গেলে প্রজাদের সায়েস্তা রাখা খুবই কষ্টকর হবে; নতুন মালিক একথা বোঝে। তাই কিছুতে ছাড়তে চায় না। তাঁকে সম্মুখে রেখেই তার উচ্ছৃঙ্খলতার তরী বেয়ে যেতে সে চায়। কিন্তু ম্যানেজার চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বদ্ধপরিকর। অন্নদাতা মালিকের ইচ্ছাপূরণে, বেতনভুক কর্মচারীর অসম্মতি অহংসর্বস্ব নবীন জমিদারের আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিল। ক্রোধাগ্নিতে সমিধাহুতি দিবার ঋত্বিকের অভাব তখন তার নাই। ফলে পর পর কয়েকটি জটিল ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় হৃদয়নাথ জড়িত হয়ে পড়লেন। মামলায় পরাজিত হলে তাঁর কারাবাস অবশ্যম্ভাবী। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের অর্থানুকূল্যে উদ্ধার পাওয়ার পথগুলো সবই বন্ধ। হৃদয়নাথ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

হৃদয়নাথের এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাঁকে যোগীরাজ বরদাচরণের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দিলেন। বন্ধুটিকে সঙ্গে ক'রেই একদিন হৃদয়নাথ লালগোলায় এসে সাশ্রুনয়নে আদ্যোপান্ত সমস্ত বললেন।

নির্দোষীর চোখের জল যোগীরাজের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে থেকে বললেন—"আপনার ভয়ের কিছুই নাই। আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। নিশ্চিন্ত মনে মামলায় করণীয় যা কিছু করুন গে। আর এই মন্ত্রটি প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ১০৮ বার নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করবেন। প্রতিপক্ষ আপনার প্রবল। সেটা কেবল ধনের দিক দিয়ে, সত্যের দিক দিয়ে নয়। আপনার সত্যই আপনাকে রক্ষা করবে। কোনও চিন্তা করবেন না। আর যা করার আমি করব।"

যথারীতি চল্‌তে চল্‌তে একদিন মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু বাদী পক্ষ প্রবল, ধনী। আশার আলো আসামী পক্ষের কারও মনেই উঁকি দিচ্ছে না।

যথা নির্দিষ্ট দিনেই মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হল। রায় হৃদয়নাথের সম্পূর্ণ অনুকূলে।

ভরা ডুবি থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা পেয়ে হৃদয়নাথ লালগোলা এসে যোগীরাজের চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন।

বাইশ

একদিন এক প্রৌঢ় দিল্লী থেকে এলেন। বললেন—"আপনার নিকট আত্মীয় প্রবোধ আমার ছেলের বন্ধু। তিনিই আমাকে আপনার কথা বলেছেন এবং ঠিকানা ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নাম—(নামটা এতদিন পরে স্মরণে আন্‌তে পারছি না)।

বরদাচরণ—দিল্লীতে কি করেন ?

প্রৌঢ়—লেখার কালি তৈরি করে বিক্রি করি। এ আমার অনেক দিনের ব্যবসা। সুনামও যথেষ্ট। প্রতিদ্বন্দ্বীও কেউ নাই। মানও পূর্ববৎ একভাবেই রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে মন্দা পড়তে পড়তে বর্তমানে একেবারে অচল অবস্থায় এসে পড়েছে। ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে গেলে দিল্লীর মত জায়গায় বৃহৎ পরিবার নিয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে। এ বিপর্যয়ের হেতু আর তার প্রতিকার কি আমাকে বলে দিন।"

বরদাচরণ ধ্যানস্থ হলেন। কিছু সময় পরে চোখ খুলে প্রৌঢ়ের মুখের পানে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন—"বিপর্যয়ের কারণ তো বাইরে খুঁজে পাবেন না। সে কারণ ভিতরের। বিশ্বাস হবে কি ?

প্রৌঢ়—আপনার অসাধারণ যোগশক্তির কথা সব জেনেই আমি এসেছি। আপনার কথা সবই বিশ্বাস করব।

বরদাচরণ—আপনার স্ত্রী কিছু উগ্র প্রকৃতির। তাই না ?

প্রৌঢ়—হ্যাঁ—তার প্রকৃতি কিছু উগ্রই। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এই ব্যবসার সঙ্গে—

বরদাচরণ—তাঁর ব্যবহারই এই বিপর্যয়কে ডেকে এনেছে। এক ক্ষুধার্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তিনি ভরা দুপুরে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আপনি বোধহয় তা জানেন না।

প্রৌঢ় অতীব বিস্ময়ে—কই আমি তো তা জানি না।

বরদাচরণ—সেই ব্রাহ্মণের মনোব্যথাই এই বিপর্যয়ের হেতু।

প্রৌঢ়—এর প্রতিকার কি বলুন।

বরদাচরণ—সেই ব্রাহ্মণকে সসম্মানে বাড়ি এনে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবেন আপনার স্ত্রী, তারপর নিজের হাতে আহার্য প্রস্তুত ক'রে খাইয়ে সেই উচ্ছিষ্ট কণা আপনার স্ত্রী প্রসাদরূপে গ্রহণ করবেন। আর আপনারা দুজনেই এই মন্ত্র ১০৮ বার ক'রে দুই বেলা একত্রে একাসনে বসে জপ করবেন।

যোগীরাজের নির্দেশ তাঁর স্ত্রী অমান্য করেন নি। ব্যবসায় পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই প্রৌঢ় বরদাচরণের একজন অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে আরও কয়েকবার লালগোলা এসেছিলেন। বরদাচরণের কাছে সাধন জেনে গেছেন।

তেইশ

তমাল তলার ছায়াশীতল চত্বর। কয়েকটি যোগশিক্ষার্থী ছাত্র নিয়ে বরদাচরণ আলাপ-আলোচনা করছেন। একটি মুসলমান ছাত্র একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে বরদাচরণের কাছে এসে দাঁড়াল। তার বাবা খুব অসুস্থ। ছাত্রটি বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইল।

বরদাচরণ টেলিগ্রামখানা দেখলেন। ছেলেটির মুখের পানে একবার চাইলেন। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ ক'রে থেকে ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"যাবি? নাই বা গেলি—?"

কিন্তু পিতার অসুখ। ছেলেটি উতলা হয়ে পড়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক—। অনুমতি সে পেল। ছেলেটির গমন পথের দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "নিয়তির গতি রোধ করবে কে?"

যোগের ছাত্রেরা বিস্মিত হয়ে বলল, "ও কথা কেন বললেন স্যার?"

ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে বরদাচরণ বললেন, "—ও আর ফিরবে না।"

সত্যদ্রষ্টা যোগীর কথা অচিরেই সত্যে পরিণত হল। ৩।৪ দিন পরই সংবাদ এল কলেরা রোগে ছেলেটিও তার বাবার অনুগমন করেছে।

চব্বিশ

লালগোলা বোর্ডিংএরই একটি স্বাস্থ্যবান যুবক ছাত্র। সকালে পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে বোর্ডিংএর দিকে যাচ্ছে। বরদাচরণ ছেলেটির নাম ধরে ডাকলেন। সে কাছে আসতেই মৃদুস্বরে বললেন—"এক বারেই খতম্?"

যেন পলকে প্রলয় ঘটে গেল। ছাত্রটি সহসা তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, "হঠাৎ হয়ে গেছে স্যার। ইচ্ছা ছিল ভয় দেখান। দৈবাৎ আঘাতটা গুরুতর হয়ে গেছে। আমাকে বাঁচান স্যার।"

বহরমপুর শহর থেকে কিছু দূরে এক পল্লী মধ্যে ছেলেটির বাড়ি। প্রতিবেশী জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল। ছেলেটির ব্যবহৃত অস্ত্রের আঘাতে জ্ঞাতি ভাই অকুস্থলেই মারা যায়। ছেলেটির দায়রা সোপরদ্দ হয়েছে।

বরদাচরণ বললেন—"নিয়তির খেলা। মানুষ যন্ত্রমাত্র। যা এ যাত্রা তুই বেঁচে যাবি। বিচারে তুই মুক্তি পাবি। তবে এর প্রায়শ্চিত্ত তোকে ভোগ করতেই হবে। উপায় নাই!"

উপরোক্ত মামলায় বরদাচরণ জুরী ছিলেন। সত্যাশ্রয়ী যোগী সত্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি। ছাত্রটিকে তিনি নিজে দোষীই বলেছিলেন। কিন্তু বাকী ছ'জন জুরীর নির্দোষ বলায় সে অব্যাহতি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তাকে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়েছিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দোরে দোরে ভিক্ষা করতে তাকে দেখা গিয়েছিল।

পঁচিশ

মুর্শিদাবাদ জেলার নশীপুর রাজ এস্টেটের একজন কর্মচারী। বরদাচরণের যোগশক্তির কথা তিনি বিশেষভাবেই জানতেন। তাঁর অনুগতও ছিলেন। বেশ কিছুদিন সেই ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির কোনও সংবাদ পান নি। খুবই উতলা হয়ে পড়েছেন। একদিন বরদাচরণকে ধরে পড়লেন বাড়ির সংবাদ জেনে দিতে হবে। তমাল ছায়ায় তখন বরদাচরণ অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

নিজের যোগবিভূতির প্রকাশ সহসা করতে চাইতেন না এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। তাই তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে মৃদু হেসে বললেন, "একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দাওনা কেন।" রাজকর্মচারীটি তদুত্তরে বললেন, "সেই দূর পল্লীর মাঝে তার যেতে আসতে যে অনেক দিনের ব্যাপার। অত অপেক্ষা করার মত যে মনের অবস্থা নয়।"

বরদাচরণ—দিন কয়েক ছুটি নিয়ে তাহলে বাড়ি থেকে ঘুরে এস?

কর্মচারী—এখন সালতামামি। ছুটি এখন তো কোনও মতেই পাওয়া যাবে না।

ভদ্রালাকের ব্যাকুলতা দেখে বরদাচরণ রাজী হলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে চোখ মেলে বললেন—"চিন্তা কোরো না। তোমার বাড়িতে সবাই ভাল আছে। কাল পরশু মধ্যেই তুমি চিঠি পাবে।"

যোগীরাজের কথায় অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। সাধারণ স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বিশ্বাস যে বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ। ভদ্রলোকের মুখ দেখেই অন্তর্দর্শী যোগীর তা ধরে ফেলতে দেরী হয় নি। বললেন—"তোমার বাড়িতে অমন ভয়ানক একটা কুকুর রেখেছ কেন? আর রাস্তার দুধারের কাঁটালতাগুলো কেটে ফেল্‌তে পার না? তোমার কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল। পালাতে গিয়ে আমার পিঠ্‌টা কাঁটায় ছড়ে গেছে।" সত্যিই দেখা গেল তাঁর পিঠে একটা ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা রক্তমুখী ছড়ে যাওয়া দাগ।

এ ঘটনার কথা জানিয়ে ভদ্রলোক বাড়ি থেকে উত্তর পেলেন সেই তারিখ সেই সময় এক সাধুবেশধারী ভিক্ষুক বাড়ি এসেছিলেন। কুকুরটা সে সময় খোলা ছিল। সাধুকে তাড়া করেছিল। সাধু পালাতে গিয়ে তাঁর পিঠে কাঁটার আঁচড় লেগেছিল।

ছাব্বিশ

১৩৪৭ সালের গোড়ার কথা। বরদাচরণ সে সময় অসুস্থ। কলকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইউরোপ প্রত্যাগত চিকিৎসক ডাঃ কিরণেন্দু ঘোষ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। ডাঃ ঘোষ তাঁকে দেখতে লালগোলায় এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু শ্রীসেন। শ্রীসেন এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক।

বিছানায় শুয়েই বরদাচরণ ডাঃ ঘোষ এবং শ্রীসেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ বারকয়েক চাকরটির নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু সে বাড়ি নাই।

একটু ইতস্তত ক'রে শ্রীসেন বললেন—"কি করতে হবে বলুন!"

বরদাচরণ মৃদু হেসে বললেন—"তুমি কি আর পারবে? ও কাজ তোমাদের নয়।"

শ্রীসেন—"তবু শুনিই না কি কাজ?"

বরদাচরণ—"আমার পা টেপার জন্য ওকে ডাকছিলাম।"

শ্রীসেন মনে মনে ভাবলেন—'সাধক ব্রাহ্মণ—বয়োবৃদ্ধ। টিপলে ক্ষতিই বা কি?' পা দুখানিতে হাত বুলাতে আরম্ভ করলেন।

বরদাচরণের মুখে অতি মৃদু রহস্যময় হাসির রেখা—বললেন, "কত টাকা জমালে?"

শ্রীসেন হেসে—"হবে কিছু—লাখ খানেকের মত।"

বরদাচরণ—“আমি তো দেখতে পাচ্ছি ডবলেরও অনেক বেশী। ঠিক ক'রেই বলনা কেন ?”

সহসা শ্রীসেনের সর্বাঙ্গে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ ব'য়ে গেল। তিনি নিজ অন্তরে বেপ উপলব্ধি করলেন যে এটা যোগীবরের একটা পরীক্ষা। ছোট বড় কাজের যে একটা সংস্কার সংগোপনে তাঁর মাঝে রয়েছে; যোগীবর সেই সংস্কারগুলোকে দূর করার জন্যেই এটা করেছেন। শ্রীসেনের অন্তরে বয়ে গেল একটা আনন্দের প্রবাহ। ধীরে ধীরে বললেন—“একটা কথা বলছিলাম ?”

বরদাচরণ—“কি কথা বল।”

শ্রীসেন—আমি দীক্ষা নিতে চাই। মন্ত্রদীক্ষা আমাকে দিবেন কি ?

বরদাচরণ কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে থাকার পর বললেন—“নাঃ—মন্ত্রদীক্ষার সময় এখনও তোমার হয় নি। দু' বছর পরে দীক্ষা পাবে।”

শ্রীসেন দীক্ষা পেলেন না। খুব নিরাশ হয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন।

পরবর্তীকালের ঘটনা শ্রীসেন বললেন—

“মানসিক অশান্তি চরমে এসে দাঁড়াল। নিজেই উপলব্ধি করতে পারলাম নিজের অযোগ্যতা। ক্ষেত্র আমার আজও প্রস্তুত হয় নি। আমাকে এখনও দীর্ঘ দুটি বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। ভাবলাম কোনও প্রকারে এই সময়টা কাটাতেই হবে। তাই কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। অর্থের প্রতি আমার প্রবল আসক্তি যোগীবারের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তাই তিনি সেদিন আমাকে ঐ ইঙ্গিত করেছেন। চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে ঐ প্রবলতম লালসার থেকে মুক্ত হতে পারি। যাতে মহাপুরুষের দীক্ষার উপযোগী হতে পারি। ধীরে ধীরে সব কিছুতেই নির্লিপ্ত অভ্যাস করতে লাগলাম।

সহসা মাথায় যেন বাজ পড়ল। সংবাদ এল সেই মহামানব দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর দেওয়া আশ্বাস মিথ্যা হয়ে গেল? সত্যাশ্রয়ী মহাযোগীর বাক্য তো মিথ্যা হওয়ার নয়! তবে? অন্তর হতাশায় মুষড়ে পড়ল।

কেটে গেল এক এক ক'রে অনেক দিন।

একদিন কাজ শেষ ক'রে বিকালবেলায় ঘরে ফিরছি, বড় রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় ভস্ম বিভূষিত, জটাজুটধারী, সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসীর পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল। সন্ন্যাসী হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালাম। সন্ন্যাসী বলেন—"বাবা! তোমার প্রতীক্ষাতেই এখানে বসে আছি। আজ যে তোমার দীক্ষার দিন।" অবাক বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখের পানে চেয়ে রয়েছি। এ কি আশ্চর্য কথা।

আমার মনের ভাব বুঝে সন্ন্যাসী মৃদুহাসি মুখে বললেন—"তোমার কি মনে নেই বাবা, এক মহাপুরুষ 'দু'বছর পর দীক্ষা হবে' বলেছিলেন? আমার উপর আদেশ হয়েছে। আমি তোমাকে দীক্ষা দিব।"

অকস্মাৎ বিস্মৃতির কালো যবনিকাখানি ধীরে ধীরে সরে গেল। শ্রীসেনের মনের পাতায় বরদাচরণের বাণীটি জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। হ্যাঁ, আজই সেই নির্দিষ্ট দিন। আর কালক্ষেপ না ক'রে সন্ন্যাসীর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। সত্যাশ্রয়ী মহামানবের কৃপার কথা মনে ক'রে উদ্দেশে তাঁর চরণে শতকোটি প্রণাম রাখলাম।"

সাতাশ

১৩২৯ সালের মাঝামাঝি সময়। মধ্যম পুত্রটির কালাজ্বর। তখনকার দিনে ডাঃ মূর বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে কালাজ্বরের চিকিৎসা করতেন। বরদাচরণ পরিবারের সকলকে নিয়ে কাটোয়ার শ্রীবনবিহারী সাধু মশায়ের একখানা বেশ বড় খালি বাড়ি অল্প ভাড়ায় পেয়ে সেই বাসাই ভাড়া নেন এবং ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দুটি ছাত্র সেখানে থেকে তাদের তত্ত্বাবধান করত। বরদাচরণ শনিবার যেতেন। এই ভাবেই চলছিল।

বাড়িটার সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মনে একটা ভীতিজনক সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। অনেক রকম উৎপাতের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত ছিল। কিছুদিনের মধ্যে বরদাচরণের পরিবারবর্গও নানা অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে লাগলেন। রাত্রে মনে হত রান্নাঘরে কে যেন ঝরঝর ক'রে জল ঢালছে। কে যেন খস্‌খস্ ক'রে চলে বেড়াচ্ছে—ফিস্‌ফিস ক'রে কথা বলছে। মাঝে মাঝে একটা উৎকট আঁসটে গন্ধে দম আট্‌কে আসত। ভাড়াটিয়া পরিবারটি ভয়ে ভয়েই রাত কাটাতেন।

একদিন এক অন্তরঙ্গ ভক্তের আহ্বানে বরদাচরণকে শ্রীখণ্ডে যেতে হয়। সেই রাত্রেই তাঁর পরিবারবর্গ অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান। কারণ ঐ সব অস্বাভাবিক উৎপাতগুলোর হয় বাড়াবাড়ি।

ভোরে শ্রীখণ্ড থেকে ফিরে বরদাচরণ সব শুনলেন। কিছুক্ষণ

স্তব্ধভাবে থেকে তারপর ছেলে দুটিকে বললেন—"বাজারে যা। দুটো মাগুর মাছ নিয়ে আয়। ছেলে দুটি মাছ আনল। বললেন, "মাছ দুটোর গলা অর্ধেক কেটে বাড়ির পাশের নিমগাছের মাথা টপকে ফেলে দে। ওদিকে আর ফিরে তাকাস্ নে।"

বরদাচরণ বললেন—"একটি অল্পবয়স্কা বৈষ্ণবী ভিখারিণীর প্রেত-আত্মা ঐ নিমগাছটি আশ্রয় ক'রে রয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুই তার প্রেতযোনী প্রাপ্তির হেতু। কোনও বিধর্মী অথবা সাধক ব্যতীত এই বাড়িতে অন্য কেউ বাস করতে পারবে না।

আঠাশ

লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট অফিস ঘরে বসে রয়েছেন। টিফিনের ঘণ্টা বাজল। প্রবেশ করলেন একজন শিক্ষক। রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। লালগোলারই অধিবাসী। বরদাচরণের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু এবং সহকর্মী। রমেশ-চন্দ্র নিজেও বরদাচরণের কাছে যোগ শিক্ষা করতেন। বরদাচরণের অধ্যাত্মপথ যাত্রার যাবতীয় সংবাদ রাখতেন। রমেশচন্দ্র এসে তাঁর সম্মুখের চেয়ারেই বসলেন। উভয়ে কয়েক মিনিট কথাবার্তাও হল। হতে হতেই বরদাচরণ চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন। চোখ দুটি ধীরে ধীরে. মুদে এল। তন্দ্রাবেশ ভেবে রমেশচন্দ্র আর কিছু না বলে কি যেন লিখবেন তাই একখানা কাগজ কলম টেনে নিলেন।

সহসা বরদাচরণের মুখ থেকে একটা সুস্পষ্ট বাণী বেরিয়ে এল "অথ আদেশানুশাসনম্।" রমেশচন্দ্র চমকে সেদিকে তাকিয়ে দেখেন তিনি আগের মতই চোখ বন্ধ ক'রেই রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে জাগল "ভাব সমাধি" নয় তো? এই অবস্থা বরদাচরণের মাঝে মাঝে হত। এর সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পরিচয়ও ছিল। হয়তো পরে মনে না থাকতেও পারে ভেবে সূত্রটি তিনি ঐ কাগজেই লিখে ফেললেন। লেখা শেষ হওয়ার পরমুহূর্তেই আবার একটি সূত্র। রমেশচন্দ্র সেটিও লিখলেন। পর পর কয়েক সেকেণ্ড ব্যবধানে

বারটি সূত্র ঐ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল। রমেশচন্দ্র সব কটি লিখে তাঁর মুখের পানে চেয়ে বসে রইলেন।

টিফিন শেষ হল। বেজে উঠল ক্লাস আরম্ভের ঘণ্টা। ঐ শব্দে বরদাচরণও জেগে সোজা হয়ে বসলেন। দেখেন রমেশচন্দ্র তাঁর মুখের পানে চেয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠছে একটা জিজ্ঞাসার ভাব —যেন কিছু জানতে চান।

বরদাচরণ—কিছু কি বল্‌বে ?

রমেশচন্দ্র—কৈ না তো।

বরদাচরণ—তোমার চোখে যেন জিজ্ঞাসার ভাব।

রমেশচন্দ্র—"তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই চুপ ক'রে বসে আছি।" রমেশচন্দ্র বুঝতে চান ঐ সূত্রগুলোর কথা তাঁর মনে আছে কিনা। আরও কিছুক্ষণ নানা কথায় কাটল। বরদাচরণ জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ক্লাস নাই ?" রমেশচন্দ্র বললেন "না।" কথাগুলো তাঁর মনে নাই। জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে ?"

বরদাচরণ—মৃদু হেসে "তুমি কি দিবা স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করছ ?" তাঁর কথায় রমেশচন্দ্র হেসে উঠলেন। বললেন—"না না, দিবা স্বপ্ন তুমি দেখ জানি। তুমি তন্দ্রাঘোরে যেন কি সব বলছিলে।" বরদাচরণ ঔৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি সব বলছিলাম ? তোমার কিছু মনে আছে ?"

রমেশ—বারটি সূত্র তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি সব কটিই লিখে নিয়েছি।

বরদা—বারটি সূত্র। কি বলত শুনি।

রমেশচন্দ্র পর পর পড়ে গেলেন।

১। অথ আদেশানুশাসনম্। ২। অথ ভূভার ধারণম্।

৩। " প্রকটানুশাসনম্। ৪। " ভূমোদ্বোধনম্।

৫। " খ্যাতিপাপনাশনম্। ৬। " বীরাচার ভূষণম্।

৭। অথ ত্রিপুণ্ড্রধারণম্। ৮। অথ জ্ঞানাজ্ঞাননাশনম্।
৯। ,, বিবেকানুশীলনম্। ১০। ,, মৌনব্রত পালনম্।
১১। ,, প্রীত্যনুসরণম্। ১২। অথ কেবলম্, কেবলম, কেবলমিতি॥

অত্যন্ত আগ্রহ ভরে কাগজখানি রমেশচন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে বার বার পড়লেন। তারপর সহসা চেয়ারে বসেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। রমেশচন্দ্র উৎসুক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। কিছু পরে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"রমেশ, সব আগে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যদি ওগুলো লিখে না রাখ্‌তে তাহলে আরও কতদিন যে আমাকে অপেক্ষা করতে হত কে জানে।" রমেশচন্দ্র কথার ভাব বুঝতে পারছেন না তাই বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন—"ওগুলোর কোনও অর্থই তো বুঝতে পারছি না বরদা, কি ব্যাপার বলত?"

বরদা—একটা পরিকল্পনা প্রকাশের পথ না পেয়ে মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল। আজ ভগবানের অসীম অনুম্পায় তা মুক্তির পথ পেল।

রমেশ—কি পরিকল্পনা কৈ আমাকে তো কিছু বল নি?

বরদা—তোমাকে বলি নি পথটা সুস্পষ্ট ছিল না বলে। পরিকল্পনাটাই ছিল অসম্পূর্ণ। ভগবানের অনুগ্রহে আজ সেটা স্পষ্ট হল। আমার অধ্যাত্ম-সাধন-প্রণালীটি কিভাবে প্রচার করা যায় মনে মনে সেই পথটাই খুঁজছিলাম। পথ আজ নিজেই আমার সম্মুখে এসে পড়েছে। এই বারটি অনুশাসনের মাধ্যমেই আমার ভাবধারা প্রকাশ করতে পারব।

উনত্রিশ

রমেশচন্দ্র আর একদিনের এক বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। বরদাচরণের কাছে তিনি যোগ শিক্ষা করতেন একথা পূর্বেই বলেছি।

একদিন, সেদিন কি কারণে স্কুলের ছুটি। দুই বন্ধুতে স্বর্গীয়া রাণী ভবানীর স্থাপিত কিরীটেশ্বরী কালিমন্দিরে যান। বরদাচরণ বিগ্রহের একেবারে সম্মুখে ধ্যানাসনে বসলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর পিছনে বেশ কিছুটা দূরে আসন পাতলেন। কতক্ষণ পরে তা তিনি বল্‌তে পারেন না—সহসা কেন যেন তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল। চোখ খুলেই তিনি ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ও কি? সমাধিমগ্ন বরদাচরণের পিঠ বেয়ে একটা কাল রঙের সাপ ধীরে ধীরে মাথার দিকে উঠছে। রমেশচন্দ্র দারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন নি। এ সময় চিৎকার বা কোনও প্রকার চঞ্চলতা চরমতম বিপদ ডেকে আনবে বুঝে কম্পিত কলেবরে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্থাণুর মত চেয়ে বসে রইলেন। সাপটি ঘাড়ের উপর গিয়ে বেশ কয়েক সেকেণ্ড ফণা বিস্তার ক'রে থাকার পর ডান কাঁধের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কোলের উপর নেমে, ডান হাঁটুর উপর দিয়ে চলে গেল বেদীর পেছনের একটা গর্তে। রমেশচন্দ্রের সর্বশরীর তখন আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সময়ের জ্ঞান নাই। সারা শরীরে শীতল ঘাম।

কতক্ষণ পরে বরদাচরণের সমাধি ভঙ্গ হল। মন্দিরের বাইরে এসেও রমেশচন্দ্র কাঁপছেন। ঘটনাটি তখনই বরদাচরণকে বলেন নি। কিরীটেশ্বরীর গভীর জঙ্গল পার হয়ে এসে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বললেন।

ত্রিশ

জানি না পূর্বজন্মার্জিত কোন পুণ্যবলে বরদাচরণের সেবা ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যার ফলে বহুবিশ্রুত মনীষী, পণ্ডিত, ভক্তসাধক, সংসার ত্যাগী উচ্চকোটির সন্ন্যাসী প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, সঙ্গ এবং সেবার অধিকার লাভ করতে পেরেছিলাম।

অন্তরঙ্গ ভক্ত, এবং অনুরাগীগণের অনুরোধ বরদাচরণ উপেক্ষা করতেন না। তাই সহসা একদিন আদেশ হল "চল শ্রীধাম নবদ্বীপ। প্রস্তুত হও।" দিন স্থির ক'রে একান্ত অনুরাগী এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু, নবদ্বীপধাম নিবাসী শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী মহাশয়কে পত্র দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নবদ্বীপধামে পৌঁছে গোস্বামী মহাশয়ের অতিথি হলেন। গভীর রাত পর্যন্ত শুনলাম তাঁদের যোগ সাধন ও ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

পরদিন প্রাতে অনুরাগী ভক্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল। তারপর গেলেন তাঁর নিমতিতা স্কুলের সহকর্মী ও সুহৃদ যোগীন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ তীর্থ মহাশয়ের বাসভবনে। অপরাহ্নে বরদাচরণের ইচ্ছায় গোস্বামী মশাই নিয়ে গেলেন নবদ্বীপ সমাজবাড়িতে ললিতাসখীর কুঞ্জে।

রাধারমণ চরণদাস বাবাজী (বড়বাবাজী) মহারাজের শিষ্য, সখীভাবের সাধক ললিতাসখী একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্বান পুরুষ।

সখীভাবের নিরবছিন্ন-নিরলস সাধনার ফলে তিনি ঐ ভাবেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন।' শ্রীধাম বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধারাণীর কায়ব্যূহ স্বরূপা ললিতার সেবা ও প্রেমভক্তির ভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে তদনুরূপ আচার ব্যবহার সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য ভাবেও নারীসুলভ বেশভূষা এবং বিলাস ভঙ্গীতে অন্তঃপুরচারিণী হয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপের সমাজবাড়িতে নিজ কুঞ্জে সাধিকা গৃহ কর্ত্রীরূপে বাস করতেন।

বরদাচরণ কুঞ্জদ্বারে উপনীত হতেই বিপুল সমাদরে ললিতাসখী তাঁকে গ্রহণ করলেন। তাঁরা দুজনেই দুজনের পূর্ব পরিচিত ছিলেন। পরস্পর যখন অন্তরঙ্গভাবে ভগবৎতত্ত্ব, ভজনতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বিষয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন—তখন দুজনের পাণ্ডিত্য, যুক্তিমত্তা, শাস্ত্রবিশ্বাসের দৃঢ়তা; তাঁদের সাধনোপলব্ধি এবং আলোচনাকালীন উভয়ের প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি সমবেত সকলকেই মুগ্ধ এবং বিস্মিত ক'রে তুলেছিল।

ললিতাসখীর কুঞ্জে সেদিন প্রেমাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরের অভিষেক মহোৎসব উপলক্ষে স্বনাম প্রসিদ্ধ, বহুবিশ্রুত পরমভক্ত, সংকীর্তন সুধাকর শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের নাম সংকীর্তন উৎসব ছিল। ললিতাসখী বরদাচরণকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন সংকীর্তন আসরে এবং রামদাস বাবাজীও আন্তরিকতার সঙ্গেই বরদাচরণকে গ্রহণ করলেন। তিনিও বরদাচরণের সঙ্গে বহু আগে থেকেই সুপরিচিত ছিলেন।

রামদাস বাবাজী মহারাজ প্রথম জীবনে সুবিখ্যাত ভক্ত সাধক প্রভু জগবন্ধু সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট এবং তদ্‌গত চিত্ত হন। পরে প্রভু ভক্ত জগবন্ধুরই নির্দেশে প্রসিদ্ধ বড় বাবাজী রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা লাভ করেন। সংকীর্তন পটু বাবাজী মহারাজের নাম সংকীর্তন কালে তাঁর অপার্থিব ব্যঞ্জনা ও তৎসহ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ, এবং অপূর্ব সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সমাগত ভক্ত শ্রোতাদের মনে এক পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করিত।

একত্রিশ

কলকাতার গাড়িখানা সেদিন বেশ একটু দেরী করেই লালগোলা পৌঁছাল। সেই গাড়িতে এলেন একজন ভদ্রলোক—যোগীরাজের দর্শনপ্রার্থী। রুক্ষ তৈলহীন মাথার চুল, গাল দুটো খানিকটা ভিতর দিকে বসে গেছে ; ললাটে বলিরেখা, চোখদুটো ছোট ছোট কোটরগত। নাকটা বেশ উঁচু, দাড়ি গোঁফ কয়েকদিন না-কামানো। ভদ্রলোকের সারা অঙ্গ জুড়েই দীর্ঘ অত্যাচারের সুস্পষ্ট ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। এসে বরদাচরণকে প্রণাম করলেন। যোগীরাজের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তখন ভদ্রলোকের মুখের উপর নিবদ্ধ।

ভদ্রলোকের স্ত্রী নিরুদ্দেশ। ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জানালেন। প্রার্থনা "এখন সে কোথায় রয়েছে বলে দেন।"

বরদাচরণের যোগদৃষ্টিতে ততক্ষণে সমস্তই ধরা পড়েছে। তীব্র স্বরে বললেন—"কেন গেল? তোমার কর্তব্যে ত্রুটি না থাকলে সে যাবে কেন?"

ভদ্রলোক যোগীরাজের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্তই অকপটে স্বীকার করলেন। যাতে পরবর্তী জীবন শান্তিময় হয় তার উপদেশ চাইলেন। বললেন, "এবার দয়া ক'রে সে কোথায় আছে বলে দেন। আর এমন হবে না।"

বরদাচরণ—"তাকে তার যোগ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারবে? যদি পার তবেই বলব—নইলে যে গেছে তাকে যেতে দাও।"

ভদ্রলোক যোগীরাজের পাদুটো জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করলেন তাকে ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করবেন।

যোগীরাজের কৃপায় হারা পত্নী ফিরে পেয়ে ভদ্রলোক পরবর্তী জীবনে বরদাচরণের অনুগত ভক্ত হয়ে ওঠেন।

বত্রিশ

"আধারের শক্তি বুঝে যোগীগুরু যোগশিক্ষা দিবেন, এটাই নিয়ম। সমীচীনও বটে। ভিতর যার দুর্বল—লড়াই করার শক্তি যার নাই—তাকে যোগশিক্ষার পূর্বে বিশেষ চিন্তা ক'রে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথা শিক্ষার্থীর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। যেমন এ ছেলেটি পাগল হয়ে গেল।

এ ছেলেটির হৃদয় অত্যন্ত দুর্বল। যুঝ্‌বার শক্তি এর মোটেই নাই। তাই শক্তির প্রবল বেগ সইতে সে পারে নি।

ছেলেটির এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল। সে অপঘাতে মারা গেছে। ইহলোক ছেড়ে গিয়েও সে তার পরম বন্ধুকে ছেড়ে যেতে পারে নি। এতই বেশী ছিল তার আকর্ষণ। যোগ-সাধনায় এ ছেলেটি তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তা ই সেই অশুদ্ধাত্মা প্রেতটি এর অন্তর রাজ্যে গোল বাধিয়েছে। যাই হোক এর জন্যে চিন্তা করবেন না। এ অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি।"

উপরোক্ত পত্রখানি বরদাচরণ লিখেছিলেন শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়কে। বারীনবাবু কতকগুলি তরুণ ছাত্রকে যোগশিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটি ছেলে পাগল হয়ে যায়। বারীনবাবু এ সম্বন্ধে উপদেশ চেয়ে বরদাচরণকে পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। বরদাচরণের যোগশক্তির কথা বারীনবাবু জানতেন।

তেত্রিশ

আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ রেবতীমোহন গোস্বামী নিম্নোদ্ধৃত তথ্য দুটি বললেন। তাঁর কথাতেই বলি—

"দহরপাড় (নিমতিতা) এসেছি। সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হল, একবার দাদামশাইকে (বরদাবাবু) দেখে আসা দরকার। বিবাহ হওয়া অবধি অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া অবধি, শুনে আসছি তিনি অসুস্থ। এখান থেকে একদিনেই গিয়ে ঘুরে আসা যায়। ১০।১১ বছরের শ্যালকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্টেশন থেকে তার মামার বাড়ির পথ চিনতে পারবে কিনা। 'পারব' বলে সোৎসাহে সে যেতে রাজী হয়ে গেল। চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নিয়ে সকাল ৯টার গাড়িতেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

লালগোলায় তাঁর বাড়ি পৌঁছে শ্রীমান্ বাবুল "দিদিমা, দিদিমা" বলে দরজার শেকল নাড়তে লাগল। দরজার ডানদিকে একটা জানালা ছিল। তার ভেতর থেকে আমার কানে এল "দেখতো, বোধহয় নাতজামাই এসেছে।" একটু অবাক হলাম। আমার উপস্থিতি তিনি অনুমান করলেন কি ক'রে! আসব বলে কোনও খবর দিই নি। এমন কি আসব বলে কোন চিন্তা সেদিন সকালের আগে আমি নিজেই করি নি। শোনা ছিল, তিনি যোগীপুরুষ। হবেও বা।

দিদিমার সঙ্গেও সেই প্রথম সাক্ষাৎ। কিছুক্ষণ পরে রোগীর— ঘরে প্রবেশ ক'রে তাঁর শয্যার কাছে বসে প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্তা

হল; অধিকাংশই পারিবারিক কথা। তারপর আমাকে বললেন; "রোগীর ঘরের বাতাস বেশীক্ষণ মানুষের ভাল লাগে না। তুমি এখন স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করগে, বিকেলে বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যার সময় আবার আসবে।" বুঝলাম, সেদিন সন্ধ্যায় ফেরত আসা হবে না। সন্ধ্যায় আদেশ হল "কাল সকালে ঘণ্টাখানেক আমার সেক্রেটারীগিরি করতে হবে।" এটাও মেনে নিতে হল।

সকালে চা-পর্ব সেরে তাঁর ঘরে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। আমাকে বললেন, "আজিমগঞ্জের যোগেশবাবু ডাক্তারকে একখানা চিঠি লিখতে হবে। তুমি আজিমগঞ্জ হয়েই নিমতিতা যাবে তো। নিজে হাতে চিঠিখানা তাঁকে দেবে। তোমার সঙ্গে বাড়ির চাকর যাবে। ওষুধ নিয়ে সে ফিরে আসবে।" চিঠি লেখা হল······রাত্রি দশটার পর আপনি এলেন, যন্ত্রণাটা তখন বাড়ছে।······একডোজ হোমওপ্যাথি খেতে বললেন। খেলাম, কিন্তু কিছু হল না। রাত্রি দুটো নাগাদ—যখন অসহ্য যন্ত্রণা তখন আবার এসে—ওষুধ এক ডোজ খেতে বললেন। সেটা খেয়ে সকাল অবধি ঘুমিয়েছি।······।"

লিখতে লিখতে একটু লজ্জা বোধ হল। রাত্রে দু দুবার ডাক্তার এসেছে, অথচ আমি কিছুই টের পেলাম না। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি। যাহোক, আবার বেরিয়ে পড়লাম। আজিমগঞ্জে যোগেশবাবুর চেম্বারে পৌঁছুলাম বেলা ১১টা নাগাদ। তাঁর রোগী দেখা প্রায় শেষ। সহজেই চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। চিঠিতে আমার পরিচয় পেয়ে আপ্যায়নের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি বাধা দিয়ে জানালাম যে আমাকে নিমতিতা যেতে হবে, গাড়ির খুব দেরী নেই এবং সঙ্গে একটি বালক আছে। একজন চাকর এসেছে, ওষুধ নিয়ে সে লালগোলা ফিরে যাবে। যোগেশবাবুর টেবিলের এক পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করতে যোগেশ-বাবু চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, "এ যে ভৌতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে। কাল তুমি লালগোলা

গেলে কখন? রাত দশটা পর্যন্ত এক সঙ্গে বসে তাস খেললাম, তারপর কি ক'রে গেলে?"

যোগেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমরা চ'লে যাওয়ার পরই ভেতরে গিয়ে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। শুয়ে মনে হল মাষ্টার মশায়ের ওষুধ পাঠানো হয় নি, হয়তো তাঁর কষ্ট হচ্ছে, হোমিওপ্যাথি—খেলে ওটা কমতে পারে। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখলাম মাষ্টারমশাই খুব কষ্ট পাচ্ছেন। একটু চিন্তা ক'রে মনে হল এ সময় ঘুমের ওষুধ—খেলে যন্ত্রণাটা কিছু কমে। আশ্চর্যের কথা এইটুকুই যে ঠিক ঐ সময় নাগাদ তিনি ঠিক ওই ওষুধই খেয়েছেন। তা ওঁর ওরকম হয়।"

ভদ্রলোকের কৌতূহল হল। বরদাবাবুর বিষয়ে নানা রকম আলোচনায় রত হলেন। আমার গাড়ির বেশী সময় ছিল না। আমি রওনা দিলাম।"

দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনাটি নিম্নরূপ। বক্তার ভাষায়—

"পাকুড় হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটীতে তাঁর বৈবাহিক বাড়ালা গ্রামের শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরিচয়ে জানা গেল ভদ্রলোক একদা লালগোলা হাইস্কুলে বরদাবাবুর অধীনে শিক্ষকের কাজ করতেন। আমার সঙ্গে বরদাবাবুর পারিবারিক সম্বন্ধের কথা জেনে ভদ্রলোক তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন।

বরদাবাবুর গৃহে ৺কালীপুজো। শিক্ষকদের প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ। শিক্ষকদের কয়েক জনের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি এল। তাঁরা ধরে বসলেন ৺কালীপুজায় রাত্রি জেগে বসে থেকে তারপর নিতান্ত নিরামিষ খিচুড়ি খেয়ে তাঁরা তৃপ্তি পাবেন না। ছাগ বলি দিয়ে প্রসাদী মাংসের ঝোলসহ তাঁরা খিচুড়ি খেতে চান। তাঁরা জানতেন

যে মাষ্টার মশাই তাঁর বাড়িতে নিজে পূজো করেন বৈষ্ণব মতে এবং সে পূজা বলিবিহীন। মাষ্টার মশাই নিজের কথাটা তাঁদের বোঝা-বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা নিজ অভিপ্রায়ে অটল। ৺কালী পূজায় বলিদান যখন অবিহিত নয় কখন তাঁদের এই সামান্য অভি-প্রায়টা পূর্ণ করতে মাষ্টার মহাশয়ের আপত্তিটা কোন কাজের কথা নয়। এতগুলো লোকের তৃপ্তির জন্যে পাঁঠাবলি দিতে দোষ কি? অগত্যা মাষ্টার মশাইকে রাজী হতে হল। তবে তিনি বললেন পূজো শেষ হতে রাত্রি গভীর হবে। তাঁরা যেন রাত বারোটার পর তাঁর বাসায় আসেন।

সবাই খুশী। সকলের চেয়ে বেশী খুশী এই ভদ্রলোক নিজে। কারণ তিনি সংস্কৃত পড়াতেন এবং পূজার্চনা বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চাও করতেন। শাস্ত্রীয় তর্কে তিনি যে হেড্‌মাষ্টার মশাইকে পরাস্ত ক'রে তাঁকে স্বমতে আনতে পেরেছেন, এ জন্যে তাঁর আনন্দের সীমা নাই।

রাত বারোটার পর স্কুল হোস্টেলে তাঁরা যে চারজন শিক্ষক থাকতেন তাঁরা এক সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু সারা রাত্রি ধরে হেঁটেও এই যৎসামান্য পথটুকু তাঁরা অতিক্রম করতে পারলেন না। অন্ধকার কেটে যখন ভোরের আলো ফুটল তখন তাঁরা দেখেন যে মাষ্টার মশায়ের বাড়ির পিছন দিকে একটা ডোবা পুকুরের পাহাড়ীর নিচে তাঁরা সারা রাত ধরে পাক দিয়েছেন। এ রকম অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে চরম লজ্জায় পড়ে তাঁরা আর না এগিয়ে হোস্টেলেই ফিরে এলেন। অবশ্য মাষ্টার মশাই তাঁদের আবার ডেকে নিয়ে গিয়ে নিরামিষ প্রসাদই খাইয়ে-ছিলেন।"

চৌত্রিশ

যোগীরাজ সকাশে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীগণ।

সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের আকস্মিক আগমন এবং বরদাচরণের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনা তাঁর জীবনে বহুবার হয়েছে। সাধারণ স্তরের সন্ন্যাসী তো প্রায়ই আস্‌তেন। উচ্চকোটির সন্ন্যাসী-দেরও আবির্ভাব হতে দেখেছি। কৈশোরে বটতলায় সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের কথা গ্রন্থারম্ভেই বলেছি। কাঞ্চনতলার সান্ধ্য আসরে রহস্যময় সন্ন্যাসীর আগমন কথাও ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। লাল-গোলায় আসার পরই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যাতায়াত বাড়তে থাকে। কী প্রয়োজনে যে তাঁরা আস্‌তেন এবং তাঁদের সঙ্গে কি আলাপ আলোচনা হত তার মর্ম কেবল তাঁরাই জানতেন।

১৯৩০ সালের এক সন্ধ্যা। তাঁর লালগোলার বাসভবনে অকস্মাৎ পাঁচজন সুদীর্ঘ দেহী তেজঃপুঞ্জ কলেবর, কৌপীনসম্বল জটাজুটমণ্ডিত উচ্চকোটির সন্ন্যাসী এসে উঠলেন। তাঁদের গা, হাত পায়ের চামড়া পাথরের মত এবং ফাটা ফাটা। হাত পায়ের নখ খুব বড় আর বাঁকা। প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে চোখের মণি যেন জ্বলজ্বল করছে। বাসার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে তাঁদের দলপতি বললেন—"বাচ্চা কাঁহা হ্যায়?" বরদাচরণ গৃহেই ছিলেন। বাইরে এসে হাসিমুখেই তাঁদের সম্ভাষণ ক'রে নিয়ে গেলেন ছাদের এক নিরালা অংশে। দীর্ঘ সময় ধ'রে তাঁদের আলাপ আলোচনা হল। সেবা

পরিচর্যার অবসরে তাঁদের কথোপকথনের যতটুকু কানে গেল—বুঝলাম সন্ন্যাসীদল বরদাচরণকে সংসার ছেড়ে তাঁদের কাছে যাওয়ার জন্যে বলছেন। বলছেন দশ বছরের মধ্যে জাগতিক কর্তব্যগুলো সুশেষ ক'রে সেখানে না গেলে তাঁরা আবার এসে জোর ক'রে নিয়ে যাবেন। বরদাচরণ তাঁদের কথায় সম্মত নন। তাঁর সাধনা ঘরে বসে পাওয়ারই সাধনা।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় ১৯৪০ সালে যেদিন দশ বৎসর পূর্ণ হল সেই দিনই মহামানব চলে গেলেন সাধনোচিত ধামে।

আগন্তুক সন্ন্যাসীগণের সম্বন্ধে পরে তিনি বলেছিলেন—"এঁরা অত্যন্ত উচ্চকোটির সন্ন্যাসী। চির তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে আপ্তকাম যোগী ঋষিদের বিচরণ স্থান পবিত্র উত্তরাখণ্ডের উচ্চতম গিরিগুহায় এঁরা তপস্যা করেন। এঁদের গতায়াত সূক্ষ্মদেহে, আকাশ মার্গে।

পরেও বহু সাধু, দণ্ডী সন্ন্যাসীর আগমন ঘটেছে। তাঁদেরও সেবা করার অধিকার লাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। গভীর রাত্রি পর্যন্ত শুনেছি উচ্চতম জ্ঞানতত্ত্বের, দুরূহ যোগ সাধনার মনোজ্ঞ আলোচনা।

পঁয়ত্রিশ

সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে এলেন এক মৌনী সাধু। এসে উঠলেন প্রথমতঃ লালগোলা রাজবাড়িতে। ২।৩ দিন পর রাজবাড়ির এক চাকরের সঙ্গে এলেন বরদাচরণের বাসায়। তাঁর সঙ্গে একজন সহকারী। ওরই হাতে মৌনী বাবা আহার্য গ্রহণ করতেন। সঙ্গে একটা খাতা পেনসিল। ওতে লিখে লিখেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন গভীর তত্ত্বালোচনাও ওই খাতার মাধ্যমেই হত।

সহসা একদিন মৌনী বাবা খাতায় লিখে জানালেন যে তিনি মায়ের (বরদাচরণের স্ত্রী) হাতে লুচি ও আলুর তরকারী খাবেন। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা এবং বরদাচরণের অনুমোদন অনুসারে দনুজদলনী দেবী নিজ হাতে খাদ্যবস্তু তৈয়ারী ক'রে সন্ন্যাসীর মুখে তুলে দিতে লাগলেন। সাধু সানন্দে ও প্রসন্নচিত্তে তা ভক্ষণ ক'রে তৃপ্ত হলেন।

আহার শেষ হলে বরদাচরণ সাধুটির মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"পূর্বজন্মের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এতদিনে হল। মনে পড়ে কি পূর্ব জন্মের কথা ? মনে পড়ে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-তীরের আশ্রম ? ভক্তিমতী ওই নারীও তার পূর্ব জন্মে সাধুসেবা ও পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে নিজ হাতে ওই আহার্য বস্তু প্রস্তুত ক'রে তোমার সম্মুখে ভোগ নিবেদন করেছিল। তোমার সংস্কার ও অহমিকার বন্ধন থেকে তখনও তুমি মুক্ত হতে পার নি। তাই তার ভক্তিভরে নিবেদিত ভোগ উপকরণ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। ফলে হয়ে পড়েছিলে

যোগভ্রষ্ট। এ জন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমাকে ওই নারীর কাছেই ছুটে আসতে হয়েছে। খেতেও হল ওরই হাতে ওর প্রস্তুত করা সেই খাদ্যই।"

মৌনী সাধু বরদাচরণ ও দনুজদলনী দেবীর পদধূলি মাথায় নিয়ে নিজ আশ্রম উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

মৌনব্রত সম্বন্ধে বরদাচরণ তাঁর গ্রন্থগীতা 'দ্বাদশ বাণীতে' বলেছেন—"মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে কথা না বলা এক বস্তু এবং কথা বলার প্রেরণা বন্ধ হওয়ার ফলে যে মৌনতা স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত বিকাশের রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা আর এক বস্তু। প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমটিতে মুখের কথা বন্ধ হয় কিন্তু মনের কথা বলার প্রয়োজন ফুরায় না। বাহিরের প্রয়োজনের দরজা এক প্রকার জোর ক'রে রুদ্ধ করা। তার ফলে সংযমজনিত খানিকটা আত্মপ্রসাদ ও শক্তি সঞ্চয় সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু অন্তরের প্রয়োজন—হৃদয়ের ক্ষুধা তাতে মিটে না। সেই ক্ষুধার সর্বগ্রাসী তৎপরতাকে শান্ত করার জন্যই তো সাধনা। সমগ্র চেতনার যাবতীয় প্রয়োজনকে একে একে মিটাতে মিটাতে—সাধনা মনোজগতের মাঝখানে এমন একটি রূপান্তরের সৃষ্টি করে যে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন বলে—বুভুক্ষা বলে কামনা বলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পায় না। প্রকৃত মৌনব্রতের উদ্ভব একমাত্র তখনই সম্ভব। এই মৌনতা যে একটা অবস্থান্তরের কথা—ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা না করার কথা নয়—তাতে কোনও সন্দেহ নাই।..........মৌনব্রত যেদিন জীবনে মহামৌনীকে এনে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে দিবে সেইদিন মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় চঞ্চলতাই এককালীন স্তব্ধ হয়ে যাবে।" (পৃঃ ১১৯—১৩৯।)

কঠোপনিষদ বলেছেন—"স্বয়ম্ভু মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী ক'রেই সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষ বহির্বিষয়ের নাম ও রূপ নিয়েই মত্ত থাকে। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে বিশেষ সাধনায় অন্তর্মুখী না

ক'রে জোর ক'রে সেগুলোর বহির্বৃত্তি দমন করা যায় না। অবশ্য চোখ বন্ধ ক'রে কুদৃশ্য আর কান বন্ধ ক'রে কুকথাকে প্রতিহত করা যায় সত্য; কিন্তু সেটা সাময়িক সংযম। স্থায়ী ফলপ্রদ নয়। এটা Negative side. Moral teachings-এর মাধ্যমে বাহ্য জীবনের সৌন্দর্য কিছু বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু তাতে প্রার্থিত ফল কিছুই পাওয়া যায় না। আত্মানুশীলন (self study) ব্যতিরেকে আত্মপরায়ণ হওয়া যায় না। আত্মপরায়ণ না হলে অন্তরে সেই পরম বস্তুর আস্বাদন লাভ করা যায় না। Possitive কিছু না পেলে ইন্দ্রিয়গুলো কিসের আকর্ষণে তাদের বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখী হতে চাইবে?

ছত্রিশ

বরদাচরণের আর একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন স্বামী রামদাস আচারিয়া। স্বামীজী ছিলেন আবাল্য ব্রহ্মচারী এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর মুখে তাঁর বাল্যজীবনের এবং পরবর্তী জীবনের যতটুকু জেনেছিলাম, এখানে তা পরিবেশন করলাম।

আরা জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র বংশধর। শৈশবেই মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই পরলোক গমন করেন। পৈত্রিক ভদ্রাসন ও তৎসহ সামান্য যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই বিষয় লোলুপ আত্মীয়রা ক্রমে ক্রমে গ্রাস ক'রে নেয়। অসহায় নিঃস্ব বালক মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পরের আশ্রয়ে কোনও প্রকারে দিন কাটাতে থাকে। এই যাযাবর বৃত্তি অবশেষে তাঁকে একদিন এনে ফেলেছিল সুদূর মাদ্রাজ শহরে। ভাগ্যদেবীর অসীম কৃপায় এক মহাপ্রাণ সহায়কের সহায়তায় তিনি বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করেন। ভগবৎ প্রদত্ত ধীশক্তি বলে কালক্রমে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর এক কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে ব্রতী হন।

কিছুকাল অধ্যাপনা বৃত্তিতে অতিবাহিত করার পর সহসা তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। চাকুরী পরিত্যাগ ক'রে পরিব্রাজন আরম্ভ করেন। মরুতীর্থ হিংলাজ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত

তীর্থগুলি পর্যটন করার পর জানি না কী সূত্রে বরদাচরণের সন্ধান পান এবং লালগোলা আসেন।

লালগোলার বাড়িতেই আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাই এবং পরিচিত হই। বরদাচরণের কাছে যোগসাধন প্রণালী অবগত হয়ে তিনি যোগ সাধনা আরম্ভ করেন।

স্বামীজীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত হৃদ্য এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। সমগ্র পরিবারটির সঙ্গে এমনভাবে তিনি মিশে গিয়েছিলেন, মনে হত যেন একই পরিবারভুক্ত। এখানে এলে বরদাচরণ তাঁকে সহজে ছেড়ে দিতেন না। ফলে আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে পেতাম। তিনিও আমাদের ভারতের সমস্ত তীর্থগুলোর কত মনোজ্ঞ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী শোনাতেন।

রোজ সন্ধ্যায় বরদাচরণের সঙ্গে যোগতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্রবিচার ইত্যাদি হত। এক একদিন আলোচনার তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে রাত ভোর হয়ে যেতো। হৃদয়গ্রাহী সেই সব সৎপ্রসঙ্গ এবং সদালোচনা শোনার আগ্রহে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি।

বাহ্য অনুষ্ঠানের দিকে স্বামীজীর ঝোঁক ছিল না। তিনি ছিলেন প্রবর্তক যোগী। যোগাভ্যাস নিয়েই থাকতেন। ঐদিকেই ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট ক'রে যৌগিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার একটা প্রবণতাও তাঁর ছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সে সময় সমগ্র ভারতের বুক জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বয়ে চলেছে। গান্ধীজীর "অহিংস" শব্দটির উপর স্বামীজীর কোনও আস্থাই ছিল না। তিনি বলতেন—"কেউ যদি বলে যে আমার জিভ নাই, সেক্ষেত্রে যেমন জিভ থাকাটাই সাব্যস্ত হয়, ঠিক সেই রকম আমার হিংসা নাই বললেও অবচেতনে হিংসার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। তাঁর Super mind

এ Violence আছে বলেই Non-Violence কথাটির অবতারণা করতে হয়েছে।"

দেশবন্ধুর বাসভবনে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের সামনে গান্ধীজী বলেছিলেন—"Had India sword, I would have asked her to draw it. But as she had no sword—I ask her to adopt Non-Violent Non-coperation. Non-Violence may be accepted as creed or policy. I am out to destroy this Satanic Govt." একথা থেকে তাঁর অবচেতনে হিংসার অস্তিত্ব থাকাটাই কি প্রমাণিত হয় না ?

এ সম্বন্ধে বরদাচরণের অভিমত জানা গেল। তিনি বললেন—মুখে তখন তাঁর একটা মৃদু অশ্রদ্ধার হাসি—"দেখুন অহিংসা, সাম্য, সমদৃষ্টি এইসব আভিধানিক শব্দগুলো শুনতে বেশ মধুর। কিন্তু সে প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হলে শব্দগুলোর প্রকৃত রূপ পরিস্ফুট হয়, সেই প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অভাবে এগুলো বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়। মন যতক্ষণ জ্ঞানাজ্ঞানের সীমারেখা অতিক্রম না করে ততক্ষণ এই সব মূল্যবান শব্দগুলো মূল্যহীন বাক্যচ্ছটা ছাড়া অন্য কিছু নয়। হিংসা-অহিংসা ; আলো, অন্ধকার ; জীবন, মৃত্যু ; জ্ঞান অজ্ঞান ; এগুলো পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত সে একটার অভাবে অন্যটি ধারণার মধ্যেই আসে না। একটার অস্তিত্বেই অপরটির অস্তিত্ব। মরণ আছে বলেই জীবন এত মধুর। অন্ধকার আছে তাই আলো এত আকর্ষক, হিংসা অহিংসার সম্বন্ধও তাই। গান্ধীজীর চিঠির উত্তরে আমি তাঁকে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার মতামত খুলেই জানিয়েছি।"

[গান্ধীজীর সঙ্গে বরদাচরণের পত্রালাপ ছিল। 'অহিংসা' সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে যোগীরাজ তাঁকে যা লিখেছিলেন সে পত্রের প্রতিলিপি গ্রন্থশেষে সংযোজিত হল]

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার প্রকৃত অহিংসা কোন স্তরে আসে ?"

বরদাচরণ—"দ্বিদল বা আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে ত্রিপুণ্ড্র স্থান। এই এই ক্ষেত্রকে নিরালম্ব স্থানও বলে। মনকে এই ক্ষেত্রে স্থির করতে পারলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। এই স্তরই বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থান। এই স্তরের ঊর্ধ্বে সহস্রারের সুবিমল জ্যোতি দর্শনে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। জ্ঞান অজ্ঞানের ঘাত প্রতিঘাত সেই মনকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। এই ভূমিতে উন্নীত সাধকই কেবল অহিংস হতে পারেন।"

পরব্যোমে অবস্থিত আনন্দঘন পুরুষের আনন্দের কণা ঘনীভূত হয়ে রূপপরিগ্রহ ক'রে মাঝে মাঝে আলোছায়া ঘেরা মাটির বুকে নেমে আসে। নিরানন্দ মৃন্ময়ীর মর্মকোষে চিরন্তন আনন্দের আস্বাদ পরিবেশন করতে। বরদাচরণও এসেছিলেন পৃথিবীতে আনন্দ পরিবেশন করতে। তাঁর চরিত্রের আর বৈশিষ্ট্য ছিল আনন্দময়তা। তাই যখনই যেখানে গেছেন সেইখানেই বয়ে গেছে আনন্দের উচ্ছল বন্যা। যিনি তাঁকে জেনেছেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তিনিই সেই পরম আনন্দের অমৃতধারা আকণ্ঠ পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ধন্য হয়েছেন। সে আনন্দ এমনই ছিল যে যিনি যত পান করেছেন —আরও—আরও পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন।

সাঁইত্রিশ

যোগীরাজ বরদাচরণ ও প্রবরকৃষ্ণ মজুমদার।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার রাণীনগর থানার অন্তর্গত চক্ ইসলামপুর একটা প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের বাস। চক্ ইসলামপুর সিল্ক ও মটকার জন্যে বিখ্যাত। এখানকার জমিদার বংশ খুবই বনেদী বংশ। প্রবরকৃষ্ণ মজুমদার এই বংশেরই সন্তান।

প্রবরকৃষ্ণের অগ্রজ প্রণবকৃষ্ণ মজুমদারের বিবাহ হয় কলকাতা ভবানীপুরের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক অমিয়মাধব মল্লিক মশায়ের কন্যা শ্রীমতী কনকলতা দেবীর সঙ্গে। প্রবরকৃষ্ণ এবং কনকলতার মাধ্যমেই বরদাচরণের সঙ্গে মল্লিক পরিবারের যোগাযোগ ঘটে। সে যোগাযোগ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হতে হতে আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়। বরদাচরণ কলকাতায় এলে এই পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

ইসলামপুরের জমিদার বংশের প্রজাবৎসল বলে একটা সুনাম ছিল। প্রণবকৃষ্ণ এবং প্রবরকৃষ্ণ দুই ভাই-ই সপরিবারে বরদাচরণের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। প্রবরকৃষ্ণ তাঁর কাছে যোগ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আত্মসাধন পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন।

বরদাচরণ বহুবার এই জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে

গিয়েছিলেন। বার কয়েক তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে সপরিবারেও তাঁকে যেতে হয়েছে। বেশ কিছুদিন সেখানে না থেকে ফিরতেও পারেন নি। যখনই সেখানে গেছেন, একটা লোকোত্তর আনন্দ-প্লাবন যেন সারা অঞ্চলটার উপর দিয়ে বয়ে যেতো। দূর দূরান্তের গ্রামগুলো থেকে এমন কি বহরমপুর, লালবাগ, ভগীরথপুর ইত্যাদি জায়গা থেকেও বহু গণ্যমান্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত, আর্ত ও জিজ্ঞাসু মানুষের দল ছুটে আসত, তাদের মরজীবনের কত কত সমস্যা—অমর জীবনের পথ নির্দেশের আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে। নিরাশ তিনি কাউকেও করেন নি। প্রত্যেকের কথা শুনে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে তৃপ্ত করেছেন। তাঁর মুখে ধর্মতত্ত্ব, ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনে সকলেই আনন্দ পেয়েছেন। গান, কীর্তন, ভগবৎ আলোচনায় বাড়িখানি সর্বদাই মুখরিত হয়ে থাকত। জমিদার পরিবারের আতিথেয়তা, সেবা-পরায়ণতা, যত্ন-আত্তির কথা জীবনে কোনও দিনই ভোলা যাবে না।

অন্যের মনের কথা জানতে পারা, অপরের ইচ্ছা অনুভব করতে পারা, দূর শ্রবণ, দূর দর্শন প্রভৃতি যোগশক্তির বিকাশ বরদাচরণের মধ্যে ছিল। একটা সামান্য ঘটনা থেকেই তা জানা যাবে। ঘটনাটা এই বাড়িতেই ঘটেছিল।

জগদ্ধাত্রী পূজা উৎসব। দূর বিদেশ থেকে বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। বরদাচরণও সপরিবারে গেছেন। বিশাল বৈঠকখানায় তিল ধারণের স্থান নাই। সেখানে বরদাচরণকে কেন্দ্র ক'রে গান, কীর্তন-ভগবৎ প্রসাদ চলছে। উনিও মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাধক মহাপুরুষের অলৌকিক যোগশক্তির আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাবলী পরিবেশন করছেন। সমাগত অনুরাগীগণ এই অনাবিল, লোকোত্তর আনন্দ আস্বাদন ক'রে কৃতকৃতার্থ হচ্ছেন। এই আনন্দময় পরিবেশে তৃপ্তিলাভ করার মত বয়স ও প্রবৃত্তি আসে নি এমন কয়েকজন তরুণ বাড়ির পাশের বিরাট পুকুরের এক নিরালা কোণে বসে আলাপ করছে।

অন্যান্য বছর এই উৎসবে এই দল দুই রাত্রি থিয়েটার করে। দেশের মেয়েছেলেরাও এই দিনটির জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। এবার বাড়িতে দেশবরেণ্য অতিথি। এ-সব তিনি পছন্দ করেন কি না এ-সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। কাজেই থিয়েটার সম্বন্ধে তারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছে না।

বৈঠকখানায় আলাপ করতে করতেই সহসা বরদাচরণ একটা চাকরকে বললেন—"পুকুরের পাড়ে দাদাবাবুরা বসে আছে। তাদের ডেকে আন্। বল আমি ডাক্‌ছি।"

তরুণদল এসে দাঁড়াল। নিজের পাশে তাদের ডাকলেন। হাসিমুখে বললেন—"পুজোতে কোনও উৎসব না হলে মানায় না। তাছাড়া আনন্দ দিয়েই তো আনন্দময়ীর আবাহন করত হয়। এক কাজ কর। গ্রামের মেয়েরা তো কিছু দেখতে শুনতে পায় না। দু-রাত্রি দুখানা নাটক অভিনয় কর। পারবে না? ছেলেরা সমবেত-কণ্ঠে সম্মতি জানিয়ে প্রস্তুতির জন্য চলে গেল। বরদাচরণের মুখে রহস্যময় মৃদুহাসি।

আটতিশ

জমিদার বংশের উর্ধ্বতন কোন পুরুষ গ্রামে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছিলেন। নিত্যসেবা। উত্তরকালে অধঃস্তন বংশধরগণের পাশ্চাত্য ভাবধারা-আচার-ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ দেববিগ্রহের প্রতি অনাস্থা প্রকট হয়ে উঠল। মন্দিরটিও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলল। পার্শ্ববর্তী এক গ্রামের এক দরিদ্র ভক্ত ব্রাহ্মণ বিগ্রহের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হন এবং বিগ্রহটি নিজ কুটীরে নিয়ে গিয়ে স্থাপন ক'রে যথাসাধ্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন এইভাবেই চলে গেল। ভক্ত ব্রাহ্মণ স্বধামে প্রয়াণ করলেন। তাঁর অধঃস্তন পুরুষগণ অনুক্রমে সেই বিগ্রহের সেবা পূজা কোনও প্রকারে চালিয়ে চলেছেন। কালের নির্মম আঘাত মন্দিরটিকে সমভূমিতে পরিণত ক'রে দিল। মন্দির প্রসঙ্গটি ভাসতে লাগল আকাশে বাতাসে কিংবদন্তীর রূপ ধ'রে।

উত্তরকালে এই বংশের সুসন্তান ভক্তিমান প্রবরকৃষ্ণ সেই ভেসে বেড়ান কিংবদন্তীর সূত্র ধ'রে খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন কোথায় ছিল মন্দির। সেই বিগ্রহই বা কোথায়? দূর অতীতের কথা বলার জন্যে তখন আর কেউ জীবিত নাই। শরণ নিলেন বরদাচরণের।

ইসলামপুর। বরদাচরণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঠ, পল্লীর পরিত্যক্ত স্থান কেবল ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পর পর কয়েকদিনই এইভাবেই কাটল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা পার হতে গিয়ে

সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন। সঙ্গের লোকদের বললেন "এখানে আসন ক'রে দাও।" আসন পাতা হল। বসে গেলেন সেই ধ্যানাসনে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। পূবের সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে। ধ্যানাসনে যোগীরাজের ধ্যানস্তব্ধ নিশ্চল দেহখানি সিন্দূর মাখান বলে ভ্রম হতে লাগল। দেহ-নিঃসৃত ঘামে ভিজে গেল আসন। ভিজে গেল তলার মাটি।

যোগীরাজ চোখ মেলে চাইলেন। আদেশ হল "এই জায়গাটা খোঁড়।" মাটির অনেক নিচে পাওয়া গেল প্রাচীনকালের মন্দিরের ভিত্তি।

নতুন মন্দির গড়ে উঠল সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর। ধ্যান-যোগেই ৺রাধামাধব বিগ্রহের সন্ধান জেনে সেই বিগ্রহ এনে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল।

(প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংগৃহীত)

উনচল্লিশ

একদিন বিকালে পাশের গ্রামের একজন উচ্চ শিক্ষিত মৌলানা সাহেব দুজন মৌলভী সঙ্গে নিয়ে বরদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মৌলানা সাহেব প্রবরকৃষ্ণের বিশেষ বন্ধু। তাঁদের আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে প্রবরকৃষ্ণ বরদাচরণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যোগীরাজও তাঁদের আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। নানা আলোচনার পর মৌলানা সাহেব বললেন—"আগামীকাল বিকালে বাজারে একটা ধর্মীয় জলসার আয়োজন করেছি। সেই সভায় আপনাকে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমরা অনুরোধ করতে এসেছি। আপনার মত ধর্মজ্ঞ মহাযোগীর মুখে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শুনতে পেলে আমরা ধন্য হব।

বরদাচরণ সানন্দে সম্মত হলেন।

এই সভায় বরদাচরণের ভাষণটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সেই ভাষণের সংক্ষিপ্তসারটি নিচে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

সভা যথাসময়েই আরম্ভ হল। বিপুল জনসমাবেশ। মৌলবী মৌলানাদের ভাষণ একে একে শেষ হল। এবারে সভাপতি ভাষণ দানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ভাষণের বিষয়বস্তু ইসলাম ধর্ম এবং তার প্রতীক নূর বা চাঁদ তারার গূঢ়তম ব্যাখ্যা।

তিনি বললেন—"ইসলাম শব্দটির অর্থই হল শান্তি, প্রেম,

ভালবাসা। সমস্ত মানবজাতিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে না পারলে ধর্মপ্রীতি, ঈশ্বরের বা আল্লার প্রতি ভক্তি সবই মিথ্যা। আল্লার বা ঈশ্বরের উপদেশ যে-কোনও ভক্তের কাছেই হোক তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। একটা মান্‌ব আর একটা মান্‌ব না এটা উচিত নয়। ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌ই মানুষ এবং সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই অভিব্যক্ত বিশ্বের পিতা। গীতায় তিনি একথা নিজেই বলেছেন— "পিতাহমস্য জগতো—আমিই জগতের পিতা।" সেই অনুসারে আমরা মানুষ মাত্রেই ভাই ভাই। তাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকতে পারে না। পরম সাধক ভক্ত দাদু বলেছেন—"সবঘট একহি আত্মা, কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান—সমস্ত আধার বা দেহ আধেয় বস্তু একমাত্র আত্মাই বিরাজমান।" হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য কিছু নাই।

পার্থক্য নাই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতীকে। যৌগিক—দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইসলাম্ ধর্মের "আল্লাহুঁম্" আর হিন্দু ধর্মের "ওঁম্‌হুঁম্"; ইসলাম ধর্মের 'চাঁদ-তারা' এবং হিন্দুদের নাদবিন্দু তত্ত্বের মধ্যেও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যোগমার্গে সাধনার পরিণতস্তরে পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্বিন্দু দর্শন পথে আসে আর আসে অর্ধচন্দ্র রেখা তদুপরি বিন্দু। হিন্দু দর্শন মতে একে বলে নাদবিন্দু; ইসলাম মতে চাঁদ-তারা।"

পরবর্তী কালে "রবীন্দ্র ভারতী" জার্নালে (vol III July) ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 'True religion of Man' শীর্ষক রম্য নিবন্ধে তিনি একথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"I belive ALLHA HUN of HAZRAT MAHAMMAD and the OWM HUN of the Brahamins mean the same-thing and have the same eternal glory in expressing the truth from the down most to the highest and vice-versa, Truth has been established. The crescent

moon with its shining centre seen below on the reason centre (forehead) is the symbol of the Hindus. The crescent moon with its shining centre to the right is the symbol of MAHAMMADAISM. They both represent the arch of the same circle with the same centre vividly seen at the reason centre on the forehead meaning the expression of the same, realised in INDIA and MACCA."

"নূর শব্দের অর্থ জ্যোতি বা আলো। ঈশ্বর বা আল্লাহ্র যে অপার্থিব, অকল্পনীয় জ্যোতির্ময় রূপ, সে রূপ মানবধারণার অনবগম্য; চোখে দেখার কল্পনাও উন্মাদ কল্পনা। হজরৎ মহম্মদ সেই স্বর্গীয় অলৌকিক জ্যোতি (নূর) অপরোক্ষ করেছিলেন। (HAZRAT MAHAMMAD···distinctly heard the sacred cry of ALLHA HUN ALLHUN all through. He saw the LIGHT DIVINE comming out of ALLHA HUN melted into different planes, all below. He found the truth of ALLHA HUN and LIGHT all through the different spheres from the upermost to the downmost and found nothing else but light, light, light. He saw the truth devine through light, sound, and vibration reflected in to one golden and glorious hue infinite in its expression." (True religion of man)

"সেই জ্যোতি বা আলোই সূর্য্য চন্দ্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর দেহে প্রতিফলিত হয়ে মানুষের চোখে গোচরীভূত হয়। সমস্ত আলো বা জ্যোতিই সেই মহাবিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষ ঈশ্বর বা আল্লারই জ্যোতি বা নূর। এই জ্যোতি বা নূরকে দ্বিদল অর্থাৎ আজ্ঞা চক্রে

প্রতিষ্ঠিত করাই হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধনার মূল কথা।

ইসলাম ধর্মের চাঁদ-তারা অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা আলোর রেখা আর নক্ষত্রের মত আলোর বিন্দু হিন্দুধর্মের প্রণবাক্ষর শীর্ষস্থ বিন্দু ও তার নিচের নাদ বা অর্ধচন্দ্র রেখার মতই। হিন্দুদর্শন মতে উপরোক্ত ওই বিন্দু পরব্রহ্ম এবং নিচের নাদ বা অর্ধচন্দ্র রেখাটি শব্দব্রহ্ম। এক কথায় বিন্দুটি শক্তিমান এবং নাদ চন্দ্রকলা শব্দ ব্রহ্মময়ী আদ্যা-শক্তির প্রতীক। সসীম লোক সকল এই অসীমের মধ্যেই কোন এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে, অজ্ঞাত নিয়মে সৃষ্টি স্থিতি লয় চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসীমা আদ্যশক্তি স্বাধীনা, কোনও নিয়ম বা বিধির অধীনা নন। বিন্দু সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম, আবার বৃহৎ থেকেও বৃহত্তর—বৃহত্তম। একাধারে যুগপৎ দুটি বিপরীত ভাব সমন্বিত। আগম শাস্ত্র মতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই বিন্দুতে আশ্রিত এবং পরিসমাপ্ত। ওই নাদবিন্দু (ঁ) আর ইসলাম ধর্মীয় প্রতীক দুইই যে একার্থ বোধক যে কথা আগেই বলেছি। এ চিহ্ন সব কিছুরই অতীত ভূমি, যা মন ধরতে পারে না, বাক্ যাকে প্রকাশ করতে পারে না।

সম্প্রদায়গত সীমাবদ্ধ দৃষ্টি আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যে আজ আমরা নাদবিন্দু ও চাঁদ-তারার মধ্যেকার পূর্ণতত্ত্ব, ধর্মের একত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। পৃথক পৃথক কল্পনা ক'রে পরস্পর কেবল হিংসা দ্বেষ নিয়ে মত্ত থাকি। ভুলে যাই পুণ্য গ্রন্থ কোরানের পবিত্র বাণী—"শান্তি মন্ত্র ব্যতীত পরস্পরে আর কিছু যেন কানে না শোনেন। বৃথা বাক্য ও দুষ্ট তর্কজাল যেন মানুষের মনকে দূষিত না করে।" এ পবিত্র বাণী কেই বা আজ মেনে চল্‌ছে! মহামতি মহাসাধক কবীরের একটা দোঁহা মনে পড়ল—"বেহ্রা দীন্‌হী খেতকো বেহ্রাহি খেত খায়"—সাধনাকে বাঁচাতে সম্প্রদায় গ'ড়ে তুললাম, এখন দেখি সেই সাম্প্রদায়িকতাই আমার সমস্ত সাধনা নষ্ট ক'রে দিল। তাই সমস্ত ভেদভাব হৃদয় থেকে মুছে ফেলে স্বধর্মোচিত সাধনা সহায়ে

সেই সর্বাতীত ভূমিতে উপনীত হতে পারলে নাদতত্ত্ব বা ইসলামধর্মীয় চাঁদ-তারা তত্ত্ব উপলব্ধির যোগ্যতা আসবে। তদ্ব্যতীত এ কল্পনা বাতুলতা মাত্র। হিন্দু ধর্মই হোক অথবা ইসলাম ধর্মই হোক সীমাতীত অবস্থায় উপনীত হতে না পারলে ধর্মের নিগূঢ় রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়।"

বরদাচরণের এই জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সমবেত হিন্দু মুসলমান শ্রোতাগণ, বক্তা মৌলবী মৌলানাগণ চমৎকৃত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এই অপূর্ব সমন্বিত ভাষণ শোনার পর থেকে বহু শিক্ষিত মুসলমান দূর দূর গ্রাম থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করতে আসতেন। এ ঘটনা আজ থেকে ৩৫-৩৬ বৎসর পূর্বে ঘটেছিল।

চল্লিশ

"পরার্থপরতা সাধনের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। পরার্থপরতার মূলে সেবাধর্ম—লোকসেবা।"

মানবপ্রেমিক বরদাচরণের ঐ উপরোক্ত অমূল্য উপদেশ তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী ভক্ত প্রবরকৃষ্ণের জীবনের আদর্শ ছিল। দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে তাঁর ভালবাসা ছিল জ্বলন্ত, জীবন্ত। শক্তিমান গুরুর প্রেরণায় এবং আশীর্বাদে তাঁর হৃদয়খানিও হয়ে উঠেছিল সংবেদনশীল। অপরের ব্যথা বেদনায় তাই হয়ে পড়তেন কাতর। নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও ছুটে যেতেন আর্তের পাশে, যদি তার দুঃখ ব্যথা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও লাঘব করতে পারেন।

বহরমপুর শহর থেকে কাতলামারী, জলঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র পথ ইস্‌লামপুর গ্রামের সামনের জাতীয় সড়ক। আজ ঐ সড়ক পাকা। দিনরাত মোটর বাস, ট্যাকসী, রিক্‌শা ইত্যাদি চলাচল করছে। বিরাম নাই। কিন্তু ৩৫-৩৬ বছর আগে কাঁচা রাস্তায় গরু বা মোষের গাড়ি আর হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পথের ধারেও ছিল না কোন ছায়াশীতল আশ্রয়। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পথচারী মানুষ ও পশুর অবর্ণনীয় দুর্দশা প্রবরকৃষ্ণের সংবেদনশীল অন্তরকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল।

সামান্য, তুচ্ছ কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। কত লোকই তো ছিলেন। কত ধনী। কত শিক্ষিত।

কত দেশনেতা। কিন্তু কৈ? একথা তো কারও মনেই কোন দিন সাড়া দেয় নি।

বরদাচরণ সে সময় ইসলামপুরেই ছিলেন। অনুগত, অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্তর্বেদনা উপলব্ধি করতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই এই সদিচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন।

গুরুর অনুজ্ঞা এবং আশীর্বাদ লাভ ক'রে গুরুরই পৌরোহিত্যে ঐ সড়কের ধারে রোপণ করা হল একটা অশ্বত্থ চারা। মতিলাল নেহেরুর স্মরণ দিবসে ঐ চারাটি লাগান হয়েছিল বলে গাছের নাম-করণ করা হয়ে ছিল—"মোতিলাল"।

সেদিনের সেই শিশু মতিলালের শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছায়া শীতল কোলে আজ অসংখ্য পথচারী মানুষ ও পশু ক্লান্তি দূর করছে। এই মতিলাল তলা মানবপ্রেমিক গুরু বরদাচরণ এবং সংবেদনশীল সেবাধর্মী ভক্ত প্রবরকৃষ্ণের লোকসেবার একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। সে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের তার জন্ম-কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

একচল্লিশ

১৩৪৬ সালের আশ্বিন। ইংরাজী ১৯৩৮ সালের অক্টোবর।

বরদাচরণ কলকাতায় রয়েছেন। ভবানীপুর মল্লিক বাড়িতে। শরীরটা কিছুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। দুর্বলতা যেন ক্রমশঃই বাড়ছে। চিকিৎসার ত্রুটি নাই। তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ, অনুরাগী ভক্ত ইউরোপ প্রত্যাগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক কিরণেন্দু ঘোষ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। কিন্তু স্থায়ী উন্নতি কিছুমাত্র দেখা যাচ্ছে না। মল্লিক পরিবারের সেবা-যত্নেরও কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু লীলা সংবরণ করবেন বলে যিনি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত— বাইরের শত প্রচেষ্টা সেই স্বেচ্ছাধীন, স্বতন্ত্র মহানায়ককে ধরে রাখতে পারে না। দুইবেলা উদ্বেগ-আকুল অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধু-বান্ধবের দল তাঁকে দেখে যাচ্ছেন। মল্লিক পরিবারের সকলেরই মনে যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে একটা উদ্বেগের কালো ছায়া।

মহামায়ার মহাপূজা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। আনন্দময়ীর স্পর্শানুভূতির রেশ তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি। এমনি সময় একদিন সকাল থেকেই তাঁকে কেমন যেন উন্মনা বলে মনে হল। কেমন যেন বিমর্ষ, বিষণ্ণ ভাব। সদা প্রফুল্ল প্রসন্ন চিত্ত মহামানব হঠাৎ এমন হয়ে পড়লেন কেন? সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"শরীর কি খারাপ মনে হচ্ছে? লালগোলায় কি একটা তার্ করে দিব?" বললেন—"না দরকার নাই। শরীরের

ব্যতিক্রম বিশেষ হয় নি। তোমরা উদ্বিগ্ন হ'য়ো না। আমার কেবলই যেন মনে হচ্ছে কে যেন দূর থেকে আমাকে আকুল হয়ে বার বার স্মরণ করছে। যেন কার ডাক শুনতে পাচ্ছি।" কথাগুলো আমাকে বলেই সহসা ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। নিমেষহারা চোখে সেই ধ্যানস্তব্ধ-পাষাণ-মূর্তির মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঘরে তখন তৃতীয় লোক আর কেউ নাই।

সহসা নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার মত ধ্যানস্থির মূর্তিটি যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। নিমীলিত নয়নযুগল ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়ে এল। কিন্তু যেন সেই দৃষ্টির সম্মুখে কোন আড়াল নাই। যেন মহাশূন্যের কোন অ-দেখা লক্ষ্যে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ। ঐ ভাবাবিষ্ট মূর্তি আমাকে হতভম্ব ক'রে তুলল। কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম হয়ে একদৃষ্টে ঐ পলকহীন চোখের পানে চেয়ে রয়েছি। সেই শান্ত স্থির আঁখি-তারকা দুটি ধীরে ধীরে আমার উদ্বেগাকুল চোখের উপর এসে স্থির হল। অন্তরের গভীরতম তলদেশ থেকে বেরিয়ে এল একটা চাপা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস। বললেন—"প্রবর তার অন্তিমশয্যায় বার বার আমার সাক্ষাৎ কামনা করছিল। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে এলাম। পরম শান্তিতে সে চলে গেল মহাশান্তি ধামে।" কথা কয়টির মধ্যে কী যে অন্তর্গূঢ় বেদনার প্রকাশ ছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। তখনই বুঝলাম প্রবরকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের কতখানি দখল করেছিলেন। গুরুগত প্রাণ অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা সর্বজ্ঞ গুরুর অন্তরে সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সূক্ষ্মদেহে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর শেষ শয্যার পাশে তাঁকে বিদায় দিতে।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকার পর বললেন—"প্রবরের মহা-প্রয়াণে ইসলামপুরের গৌরবসূর্য চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হয়ে গেল। সে-ই ছিল একমাত্র প্রাণবন্ত পুরুষ। নিজের গ্রামখানিই কেবল নয়—পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোরও সে-ই ছিল প্রাণস্বরূপ।

তার অভাবে সমগ্র অঞ্চলটাই যেন হয়ে গেল প্রাণহীন। এ অপূরণীয় ক্ষতি আর কোনও দিনই পূরণ হবে না।"

পরদিনই ইসলামপুর থেকে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ বহন ক'রে এল একখানি তারবার্তা।

সত্যদ্রষ্টা মহামানবের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। এক্ষেত্রেও হয় নি। প্রবরকৃষ্ণের তিরোধানের কিছুকাল পর থেকেই সমগ্র পরিবারটির উপর নেমে এসেছিল ধ্বংসের একটা করাল কালো ছায়া। অনুজকে হারিয়ে অগ্রজ প্রণবকৃষ্ণ আর প্রবরের শত স্মৃতি জড়ান ঐ ইসলামপুর প্রাসাদে থাকতে পারেন নি। বহরমপুর বাড়িতে এসে বসবাস করতে থাকেন। এবং এই বাড়িতেই তাঁর ইহলীলা সংবরণ করেন। ইসলামপুরের সেই বিশালায়তন অট্টালিকা-খানি আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। আজ সেদিকে তাকালে গভীর বেদনা অশ্রুবিন্দুর আকারে নেমে আসে বুক বেয়ে। অতীতের কত স্মৃতি মনের দর্পণে ভিড় ক'রে আসে।

বিয়াল্লিশ

বরদাচরণ ও শ্রীমদনমোহন ঘোষ।

ইস্টার্ন রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল-আজিমগঞ্জ শাখায় বাজারসহু একটি স্টেশন। ঐ স্টেশনে নেমে গঙ্গার ধারে রয়েছে শক্তিপুর নামে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। একটা বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্রও বটে। মদনমোহন ঘোষ ঐ গ্রামেরই অধিবাসী।

১৯২৬ সালে তিনি লালগোলায় এসে মহেশনারায়ণ একাডেমির অষ্টম শ্রেণীর ছাত্ররূপে ভর্তি হন। তখন বরদাচরণ উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শুধু তাই নয়, তখন তাঁর সাধনার খ্যাতি দেশ-বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মদনমোহনের অপূর্ব মেধা জাতশিক্ষক বরদাচরণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। প্রথম দর্শনেই ছাত্রটির মধ্যে একটা সম্ভাবনা লক্ষ্য ক'রে তিনি তার প্রতি একটা সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তার লেখাপড়াতে যাতে ব্যাঘাত না হয় সেইজন্য হোস্টেলের বাইরে নিজ প্রতিবেশী লালগোলা-রাজ চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীহেমলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসার বাইরের একটা ছোট কুঠরীতে মদনমোহনের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

শ্রীমদনমোহনের প্রতিভা বরদাচরণকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি তাকে পুঁথিগত বিদ্যার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আবেষ্টনে বদ্ধ না রেখে

অধ্যাত্ম বিদ্যাতেও শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যে যত্ন নিয়েছিলেন। অজানাকে জানতে জীবন-রহস্যের সূত্র আবিষ্কারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনের বই পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু পড়াই নয় ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশের অবাধ অধিকারও দিয়েছিলেন আলোচনাকালে। উপযুক্ত দিশারীর দেশনায় (Guidence) তার জীবনটা গড়ে উঠেছিল।

১৯১৯ সালে লালগোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর বেড়া ডিঙিয়ে মদনমোহন এম. এস. সিতে ভর্তি হন। কিছুকাল পড়ার পর হঠাৎ গোরখপুর সুগার মিলে মাসিক তিন শতাধিক টাকা বেতনে কেমিস্টের পদ লাভ করেন।

সুগার মিলে চাকুরীরত অবস্থাতেই তার শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু বরদাচরণ তাঁরই অধীনে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করার জন্য মদনমোহনকে আহ্বান জানান।

বরদাচরণ তাঁর যোগদৃষ্টির সন্ধানী আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন মদনমোহনের স্বধর্ম, তার ব্যবহারিক জীবনের গতিপথ। তাই গোড়া থেকেই তাকে সমর্থ শিক্ষকরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে মদনমোহনের জ্ঞান ছিল গভীর। স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে বরদাচরণের আদেশে মদনমোহনকে ছেলেদের অঙ্কের মাষ্টারীও করতে হত। এ সমস্তই তার গুরুর উদ্দেশ্য পূরণের প্রস্তুতি ছাড়া কিছু নয়। তাই তাকে ডেকেছিলেন তার স্বধর্ম-নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করতে।

কিন্তু ভ্রান্তিরূপিণী মহামায়ার ইচ্ছা এড়িয়ে যাওয়া তো সহজ নয়। তাই গোরখপুর সুগার মিলের কেমিস্ট মদনমোহন তিন শতাধিক টাকা মাহিনার উচ্চপদ ছেড়ে দিয়ে অল্প বেতনের শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারলেন না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি

বরদাচরণকে জানালেন যে শিক্ষকতা তাঁর পছন্দ নয়। সর্বদ্রষ্টা গুরু তাকে জানালেন—"এখন করলে না পরে করবে।"

সত্যাশ্রয়ী যোগীগুরুর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হতে খুব বেশী বিলম্ব হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই—জানিনা কি কারণে মিল মালিকপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় কেমিস্টের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মদনমোহনকে ঘরে ফিরে আসতে হয়।

বেশ কিছুদিন ঘরে বসে থাকার পর—পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে একজন সাইন্স টিচারের অভাবে সরকারী সাহায্য এবং অনুমোদন পাওয়ার অসুবিধা হওয়ায়, স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নামমাত্র বেতনে মদনমোহন উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হন। ঐ স্কুল থেকেই বি. টি. ট্রেনিং নিয়ে আসেন। তারপর অনেক স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। এখন তিনি তাঁর গুরু নির্দেশিত স্বধর্মানুমোদিত পথেই চলেছেন।

তেতাল্লিশ

বরদাচরণ ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বরদাচরণের আর একজন অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী ভক্ত। তিনি তাঁর কাছে যোগদীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশিত পথে বেশ কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। বরদাচরণের আত্মশক্তির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত সুরেশচন্দ্র গভীরভাবে আত্মমুখী হয়ে উঠেছিলেন। বরদাচরণের অনুরাগীগণ তাঁর কলকাতায় না থাকা কালে রোজ সন্ধ্যায় কোনও ভক্তের আবাসে সমবেত হতেন। সাধনভজন সম্বন্ধেই হত তাঁদের আলাপ-আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী। সুরেশচন্দ্র কোনও বৈঠকই পারতপক্ষে বর্জন করতেন না।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মশাই তন্ত্রাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরি মহারাজের শিষ্য প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক পূর্ণানন্দগিরি মহারাজের বংশধর। বংশানুক্রমে লব্ধ ঐতিহ্যের স্বাভাবিক প্রেরণার ফলে আধ্যাত্মিকতার দিকে তাঁর একটা সহজাত প্রবণতা ছিল। সঙ্গীত সাধনাও এই জন্মগত সংস্কার-বশে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারায় মণ্ডিত ছিল।

বিখ্যাত সঙ্গীতানুরাগী এবং সঙ্গীত বিশারদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর রম্য রচনা "ভারতের ভাতখণ্ডে সুরেশচন্দ্র" নামক প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বরদাচরণ প্রসঙ্গে বলেছেন

"সুরেশবাবুর মাধ্যমে আমিও বরদাবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেছিলাম। তাই কেবল সঙ্গীতের দিক্ দিয়েই নয় সাধনার দিক্ থেকেও সুরেশবাবুকে আমি জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা রূপেই দেখে এসেছি।"

চুয়াল্লিশ

বরদাচরণ ও ডাঃ সোয়েটেমা। (Dr. SOETEMA)

বরদাচরণের লোকোত্তর দিব্য জীবনের আলো এবং তাঁর ঋষিজীবনের প্রতিভা কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নয়—দেশের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে দূর দূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদূর ভারত মহাসাগরস্থিত যবদ্বীপ (JAVA) থেকে এসেছিলেন ডাঃ সোয়েটেমা। সঙ্গে একজন সহকারী। লালগোলায় বরদাচরণের বাড়ি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ছিলেন দুই দিন। দুজনে অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। বরদাচরণের অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান, অপূর্ব ব্যাখ্যান-শৈলী এবং অত্যদ্ভুত বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে ডাঃ সোয়েটেমা তাঁকে যবদ্বীপের Spiritual Teacher ক'রে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রচুর অর্থাগমেরও প্রলোভন দেখান। বরদাচরণ সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।

পঁয়তাল্লিশ

বরদাচরণ ও ডাঃ জারা (Dr ZARA)

সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে এসেছিলেন একজন মার্কিন পরিব্রাজক। সঙ্গে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী। মার্কিন পরিব্রাজকের নাম ডাঃ জারা। তাঁর পরিধানে রক্তাম্বর ও রক্তবর্ণ উত্তরীয়। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশরাশি। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা। হাতে জপের অক্ষমালা। সুগৌরবর্ণ আর্যোচিত দেহ। স্নিগ্ধায়ত নয়ন যুগল।

পড়ন্ত বেলায় লালগোলার পাশের এক গ্রাম সংলগ্ন ময়দানে জনসভার আয়োজন হয়েছিল। সে সভায় বরদাচরণও আহূত হয়েছিলেন। ডাঃ জারার ভাষণ সঙ্গের সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী বাংলা ভাষায় সকলকে শোনালেন। সবশেষে বরদাচরণ অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। বরদাচরণের বাগ্মীতা, জ্ঞানগর্ভ সুললিত ভাষণ এবং বচন বিন্যাসে ডাঃ জারা মোহিত এবং চমৎকৃত হয়ে যান। তিনি বরদাচরণকে আমেরিকায় অধ্যাত্মধর্মের প্রচারক এবং যোগ তত্ত্বোপদেষ্টা রূপে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রলোভনও দেন। কিন্তু যোগীরাজ সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। কোনও প্রলোভনই তাঁকে বাঁধতে পারে নি।

ছেচল্লিশ

বরদাচরণ ও অজিতকুমার সিংহরায়।

অজিতকুমার সিংহরায়, বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত অষ্টঘরিয়া গ্রামের এক ঐশ্বর্যশালী বিশিষ্ট জোতদার। অজিতকুমার অপুত্রক! একটিমাত্র কন্যা তাঁর। পাশের গ্রামেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে জামাইকে তিনি নিজের কাছেই রেখেছেন। জামাতা শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ সিংহরায় মার্জিত রুচি সচ্চরিত্র।

অজিতকুমারের স্বাস্থ্যটি ভালই ছিল না। মাঝে মাঝেই তিনি শ্বাসকষ্ট রোগে ভুগতেন। এই রোগ যন্ত্রণাই তাঁর বরদাচরণের কাছে আসার হেতু।

বরদাচরণের সঙ্গে অজিতকুমারের প্রথম যোগাযোগটি অত্যন্ত রহস্যজনক এবং বিভ্রান্তিকর। বরদাচরণের লোকোত্তর যোগদৃষ্টির প্রজ্ঞালোকে দেখামাত্রই মানুষের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট রূপে দেখা এবং নিমেষের মধ্যে কর্তব্য নির্ধারণ করার অলৌকিক অঘটনী শক্তির এটা একটা জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর সেই অসাধারণ শক্তির বলে একটা সমগ্র পরিবার কি ভাবে নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল—তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ থেকেই তা বোঝা যাবে।

বরদাচরণ তখন প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট বাসা ছেড়ে

লালগোলায় তাঁর নিজ বাড়িতে উঠে এসেছেন। কর্মরত অবস্থাতেই এ বাড়ি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। একদিন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন ; একজন কৃশকায়, রুগ্ন, ঈষন্ম্যুব্জ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এসে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। বরদাচরণ তাঁর মুখের পানে চেয়েই একেবারে রুদ্র মূর্তিতে ফেটে পড়লেন। কঠোর স্বরে বললেন—"কেন এলে ? যাও চলে যাও—এক্ষুনি চলে যাও।"

ঐ রুদ্র রূপ দেখে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভদ্রলোক কিছু বলতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বজ্র নির্ঘোষে আদেশ করলেন—"এই মুহূর্তে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—যাও।" ভীত কম্পিত কলেবরে ছলছল চোখে আর বিন্দুমাত্র বাক্য ব্যয় না ক'রে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে মাথা হেঁট ক'রে চলে গেলেন। যাওয়ার পর মুহূর্তেই বরদাচরণের সেই রুদ্ররূপ কোথায় অন্তর্হিত। আবার সেই প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি।

আগন্তুক এই ভদ্রলোকই অজিতকুমার সিংহরায়।

একদিন পরের কথা। একখানা চিঠি লিখতে হবে। লেখা হল। পত্রে গত দিনে ঐ ভাবে আঘাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার হেতু—তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিফলিত নিশ্চিত বিপদের কথা উল্লেখ ক'রে দিলেন। আরও জানালেন যে তিনি সেই রাত্রেই ফিরে না গেলে সমগ্র পরিবারটি ধন, মান, প্রাণ রক্ষার অন্য কোনও উপায় ছিল না। অজিতবাবুর অতি দুর্বল চিত্তের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে অবশ্যম্ভাবী চরম বিপদের কথা তাঁকে জানান হয় নি। যাতে পথের অন্যান্য কর্মসূচী বাতিল ক'রে সোজা বাড়ি চলে যান সেই উদ্দেশ্যে ঐ রকম সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। আশা করি বিপদ প্রতিহত হয়েছে। এইবার নিরাপত্তার ভাল বন্দোবস্ত ক'রে যেন লালগোলা এসে সাক্ষাৎ করেন।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও হয় নি। বহিষ্কারের চরম মানসিক প্রতিক্রিয়ায় অভিজাত বংশের সন্তান অজিতকুমার পূর্বপরিকল্পিত সমস্ত কর্মসূচী বাতিল ক'রে রাতের

আঁধারে মুখ ঢেকে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। ঐ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় অপমানে, ঘৃণা, লজ্জা দুঃখে মুহ্যমান হয়ে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। মনে অনুশোচনার সুতীব্র দাহ—"কেন? কোন অপরাধে এই নিদারুণ অপমান ভোগ? কেন গেলাম।"

মহাসাধকের যোগদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত চরম বিপদ রাতের গভীরে দুর্ধর্ষ দস্যুর রূপ ধ'রে অজিতকুমারের বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিপক্ষ অজিতকুমারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ অজিতকুমারের আগ্নেয়াস্ত্র যখন অগ্নিউদ্গীরণ করতে আরম্ভ করল হতচকিত প্রতিপক্ষ দলবল নিয়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে ব্যস্ত। ব্রহ্মকল্প মহাযোগীর কৃপায় ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পেল। তাঁর প্রদত্ত আঘাতের প্রকৃত রহস্য তখন অজিতকুমারের বোধে ধরা পড়েছে। অজিতকুমার মহাযোগীর চরণ উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করলেন।

কাল রাত্রি প্রভাত হল। বরদাচরণকে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে একখানি পত্র দিলেন। পত্রের উপসংহারে বললেন— "আপনার কৃপাকণাই আমাকে সর্বাংশে রক্ষা করেছে। সেদিনের— ঐ প্রত্যাখ্যানের আড়ালে যে এত বড় আশীর্বাদ লুকিয়ে ছিল তা বোঝার মত শক্তি আমার ছিল না। সেদিন তাই আমার মনে ক্ষোভের উদয় হয়েছিল। আপনার শ্রীচরণে আমি অপরাধী। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীচরণ দর্শনে যাব।

কয়েকদিন পরেই অজিতকুমার আবার লালগোলা এসেছিলেন। বরদাচরণ তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ ক'রে প্রশান্ত সহাস্য মুখে বলেছিলেন— "আর মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নাই তো? আর তোমার ভয়ের কিছু নাই। যা করবার সব ক'রে দিয়েছি। ওরা আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

বরদাচরণের অনুরাগী ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে অজিতকুমারের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করার দাবী রয়েছে। তাঁর গুরুভক্তি

অতুলনীয় ছিল। তাঁর মত গুরু সমর্পিত প্রাণ ভক্ত দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সমগ্র পরিবারটিই গুরুঅন্তপ্রাণ। সকলেই তাঁর নির্দেশিত পথে সর্বদা সজাগ হয়েই চলেন।

বরদাচরণের তিরোধানের পর অজিতকুমার তাঁর বাড়ির পাশে গুরুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শ্রীগুরুর জন্মজয়ন্তী, তিরোধান দিবসে স্মরণোৎসব এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবকল্প গুরুর পূজানুষ্ঠান উৎসব করতেন। সেই উপলক্ষে সমস্ত গুরুভ্রাতাদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনদিন ধরে শ্রীগুরুর জীবনী আলোচনা—কীর্তন—দরিদ্রনারায়ণ সেবা হত। দুর্ভাগ্য যে অজিতকুমার আমাদের মায়া কাটিয়ে শ্রীগুরু পদাশ্রয়ে মহাশান্তি ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য জামাতা শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি আগের মতই সুচারুরূপে পালন করেন।

বরদাচরণের "পথ হারার পথ" বইখানি অজিতকুমারের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অনলস প্রচেষ্টায় প্রথম মুদ্রিত হয়। বইখানি নানা-ভাবে তিনি প্রচারের চেষ্টা করেছেন। বাংলার বাহিরে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে ২০৪ নং মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ নিবাসী শ্রীকমলকিশোর কাপুর মহাশয়ের সহায়তায় হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের মহা-সম্মানিত এবং আশ্রিত অতিথি মহামান্য দলাইলামা যখন কলকাতা পরিদর্শনে আসেন সেই সময় অজিতকুমার উক্ত পুস্তিকা "পথহারার পথ" তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এবং তীব্বতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত ক'রে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার সম্বন্ধেও তাঁর মতামত জানার চেষ্টা ক'রে ছিলেন। মাননীয় দলাইলামা পুস্তিকখানি সানন্দে এবং আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ ক'রে ছিলেন।

বরদাচরণ রচিত আর একখানি ইংরাজী ভাষার পুস্তিকা "Revealed Twelve" অজিতকুমারেরই ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রচেষ্টায় শ্রীধাম নবদ্বীপের "রাধা" প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

সাতচল্লিশ

বরদাচরণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

কলকাতা ভবানীপুর। ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিকের মোহিনী-মোহন রোডের বাসভবন। দ্বিতলের একটা প্রশস্ত হলে বরদাচরণ তাঁর অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। এক ভক্তের সঙ্গে প্রবেশ করলেন একজন মধ্যবয়সী অপরিচিত ভদ্রলোক। দুজনেই ঘরে ঢুকে বরদাচরণকে প্রণাম করলেন। তিনি তাঁদের 'বসুন' বলে আবার আগেকার আলোচনায় ফিরে গেলেন। আলোচনা হচ্ছিল সাধন সম্বন্ধীয় এক গভীর তত্ত্ব নিয়ে।

বরদাচরণের বক্তব্য শেষ হল। ভক্তসঙ্গীটি আগন্তুকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বরদাচরণ আগন্তুকের মুখের পানে চেয়ে বলালন—"বলুন। যদি কিছু বলতে চান।"

ভদ্রলোক বললেন—"আমি এলগিন রোড থেকে আসছি। সুভাষবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। তিনি একবার আপনার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে চান। কখন আপনার সময় হবে তাই তিনি জানতে পাঠিয়েছেন আমাকে।"

বরদাচরণ একটু চিন্তা করে বললেন—"আমি আগামী কাল সকাল ৮টার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রস্তুত থাকব। ঐ সময় তাঁকে আসতে বলবেন। আর বলবেন যে নির্জনেই সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার ব্যবস্থা করা হবে।"

ভদ্রলোক প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পরদিন ৩।৪ জন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম এসে উপস্থিত হলেন। তারপর এলেন আরও ২।৩ জন কৌতূহলী বন্ধুবান্ধব।

ঠিক ৮টায় গাড়ি থেকে নামলেন সুভাষচন্দ্র। ডাঃ অমিয়-মাধবের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ প্রভাসচন্দ্র তাঁকে সংবর্ধনা করে নিয়ে এলেন দ্বিতলে। সিঁড়ির মুখেই বরদাচরণ সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় ছিলেন। উপর তলার করিডোরেই তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে গেলেন বরদাচরণ এবং সেই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। সেই করিডোরে তখন আমরা বহু লোক।

আড়াই ঘণ্টা পর দরজা খোলার শব্দ হল। দর্শনার্থীরা সকলেই করিডোরে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খুলে প্রথম বেরিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র। দিব্য গৌরকান্তি পুরুষ। দেখে মনে হল সারা মুখখানিতে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। কারও দিকে চোখ তুলে তাকালেন না। দৃঢ় ঋজু পদক্ষেপে নিচে নেমে গেলেন। ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সঙ্গে গেলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে।

বরদাচরণ হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। বললেন—"ঘরে চল।" অতি আগ্রহী দর্শকদের মুখের পানে চেয়ে তাঁদের উপহার দিলেন একটা অতিরহস্যময় মৃদুহাসি। বললেন—"মহাক্ষত্রিয়! যদি ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি খোলে তবে অঘটন ঘটাবে।" আগ্রহাকুল ভক্তমণ্ডলী তাঁদের নিভৃত আলোচনা সম্বন্ধে কেবল ঐ মন্তব্যটুকু ছাড়া আর কিছুই জানতে বা শুনতে পেলেন না। সে নিভৃত আলোচনা চির-নিভৃতির অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল।

লালগোলা ফিরে আসার পথে ট্রেনের কামরায় নিরিবিলি তাঁর পাশে বসে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গ উত্থাপনের লোভ সংবরণ করতে পারি নি। উত্তরে যোগীরাজ বলেছিলেন—"সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি স্বামীজীর অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। সুভাষচন্দ্র তাই স্বামীজী ও

শিবাজী দুজনেরই ভাব-পরিপুষ্ট। শিবাজীর এক ধর্মরাজ্য আর সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড ভারত লক্ষ্য একই।"

যোগীরাজের কথা সুভাষচন্দ্রের পরবর্তীকালের উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। তরুণ বয়সে যেমন তিনি ভারতীয় সভ্যতার মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারত জাগরণের অগ্রদূত বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন; যৌবনেও তেমনি ছত্রপতি শিবাজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই দুই ভাবধারাই ছিল তাঁর কর্মশক্তির উৎসস্বরূপ। তিনি বলেছেন :—

"In my practical life I was going to emulate Ramkrishna and Vivekananda as far as possible and in my case I was not going in for a wordly career. This was the outlook with which I faced a new chapter in my life. The philosophy which I found in Vivekananda and Ramkrishna came nearest to meeting my requirements and offered a basis on which to reconstruct my normal and practical life. It equipped me with certain principles which to determine my conduct or line of action whenever any problem or crisis arose before my eyes."

শিবাজীর ভাবাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব উক্তি :—

"In the entire life story of Sivaji, I like this occation (his escape) most. It was a tit for tat. Real gaerrilla tactics. In fact this was itself the blowing seed of Azad Hind's birth."

(Amrita Bazar Patrika 23rd June 1946)

এই সাক্ষাৎকার সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের কিছুকাল পূর্বে এবং যোগীরাজের মহাপ্রয়াণের পূর্ববর্তী বৎসর ১৯৩৯ সালে (বাংলা ১৩৪৫ সালে) সংঘটিত হয়েছিল।

আটচল্লিশ

বরদাচরণ ও শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বনামধন্য নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য এবং কৃতী-পুত্র সুর-সুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের পরিচয় নতুন ক'রে দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। যিনি নিজ নামেই প্রসিদ্ধ তাঁর আবার অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

দিলীপকুমারের সঙ্গে বরদাচরণের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মশায়ের মাধ্যমে। এ যোগাযোগের বিস্তৃত বিবরণ দিলীপকুমার নিজে তাঁর স্বরচিত "স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। বিবরণটি তাঁর কথাতেই এখানে তুলে দিলাম।

দিলীপকুমার সে সময়টায় একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের অতি আগ্রহে তিনি শ্রীঅরবিন্দের শরণ নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীদিলীপকুমার বলছেন—"শ্রীঅরবিন্দ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন অনন্যোপায় হয়ে শ্রীঅভেদানন্দ স্বামীর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সরাসরি তাঁকে গিয়ে বললাম আমাকে দীক্ষা দিবেন কি?' তিনি রাজী হলেন। এই সময় আমার এক বন্ধু (ইনি পরে অরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করেন) আমাকে বললেন, 'অভেদানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে তার এক যোগী বন্ধুর উপদেশ নিলে মন্দ কি?'

বন্ধুবর বলেন 'তিনি মস্ত যোগী, নাম বরদাচরণ মজুমদার—লালগোলা স্কুলের হেড মাষ্টার।' শুনলাম রাতে দশ বারো ঘণ্টা তিনি একাসনে বসে ধ্যানস্থ থাকেন। মহাউৎসাহে ছুটলাম বন্ধুর সঙ্গে লালগোলায়। এই বরদাবাবুর কাছেই পরে কাজী নজরুল ইসলাম দীক্ষা নিয়েছিলেন ও শুনেছি দ্রুত উন্নতিও করেছিলেন। তারপর কেন পাগল হয়ে ছিলেন তাও জানি কিন্তু বলব না। আরও এই জন্য যে তার সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশের কোনও সম্বন্ধ নাই।

বরদাবাবুর কথা একটু ফলিয়ে না বললেই নয়। শুধু তাঁর কাছেই আমি সর্বপ্রথম যোগবিভূতির পরিচয় পাই বলেই নয়—মানুষটিকে দেখে আমার গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল বলেও বটে। পরে নানা বন্ধুর কাছে তাঁর নানা অলৌকিক শক্তির কথা শুনি। অনেক কথা বিশ্বাস করতে পারি নি সে সময়। কিন্তু পরে এই সব শক্তির বিকাশ ইন্দিরার মধ্যেও প্রত্যক্ষ ক'রে আজ মনে হয় বরদাবাবুরও এই সব যোগবিভূতি ছিল—যথা দূর দর্শন, পরের চিন্তার খবর পাওয়া, ধ্যানে দেখতে পাওয়া কার কি স্বধর্ম ইত্যাদি। আমার এক বন্ধুর কাছে পরে পণ্ডিচেরীতে শুনেছিলাম বরদাবাবুর একটি বিশেষ শক্তির কথা। অঘটনটি বলার মত তাই সংক্ষেপে বলি :—

"বন্ধু আমাকে কথায় কথায় বলেন যে বরদাবাবুর কাছে তিনি বিশেষ ঋণী।" কি হয়েছিল বন্ধুর কথাতেই বলি।

"আমার শিশু পুত্রটির পেটের অসুখ কিছুতেই সারে না। ছয় মাসের শিশু—ডাক্তার বলে পেটে ফোঁড়া অপারেশন করতে হবে, না করলে বাঁচবার আশা নেই। ভয় পেয়ে সোজা লালগোলা চলে গেলাম। বরদাবাবুর কাছে—যেমন আরও অনেকে যেতেন বিপন্ন হয়ে। তিনি সব শুনে আমাকে সামনে বসিয়ে ধ্যান শুরু করলেন। একটু বাদে বললেন, "তোমার ছেলের পেটে ফোঁড়া হয় নি ক্রিমি হয়েছে। অমুক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াও সেরে যাবে।" আমার ধড়ে প্রাণ এল। কলকাতায় ফিরে ঔষধটি ছেলেকে খাওয়াতেই

পরদিন দাস্তর সঙ্গে বহু ক্রিমি বেরিয়ে গেল—ছেলে আমার বেঁচে গেল।

আরও শুনেছিলাম বরদাবাবুর মুখেই যে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি দেখেছেন নিজে লালগোলায় বসে। একে বলে (দ্রঃ 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থ by দিলীপকুমার) দূরদর্শন। ইন্দিরার মধ্যে এ শক্তির প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখি বহু বৎসর পর।

বন্ধুর সঙ্গে বরদাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সাদরে বসালেন। সব শুনে আমাকে সামনে রেখে ধ্যানে বসলেন। খানিক বাদে বললেন একটু আশ্চর্য হয়েই—"আপনি কেন অন্য গুরু করতে যাচ্ছেন ? শ্রীঅরবিন্দই আপনার গুরু।" আমি (আশ্চর্য হয়ে) "সে কি ? তিনি তো আমাকে দীক্ষা দিতে চাইলেন না।"

বরদা—(দৃঢ়স্বরে) তিনিই আপনার গুরু। আপনি ভাগ্যবান। হিমালয়ের নিচে এত বড় যোগী আর এখন নাই।

আমি—(ঠাহর না পেয়ে) কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন আমার সময় হয় নি। আমি সব ছাড়তে পারি কিন্তু গান ছাড়তে পারি না বলায় বললেন এই কথা যে আমার জিজ্ঞাসা এখনও বুদ্ধির কোঠায়ই আছে তাই তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন না।

বরদা— (হেসে) তবে শুনুন—তিনি আমাকে এই মাত্র বলে গেলেন—আপনার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে—ওকে মানা কর অন্য গুরু বরণ করতে—সময় হলেই আমি ডেকে নিব ওকে।

ঠিক এই কথাগুলিই বরদাবাবু বলেছিলেন—আমি সাজিয়ে বলছি না। এ তো ভুলবার কথা নয়—তাই ভুল হওয়া অসম্ভব। আরো এই জন্য যে বিস্ময়ের অথৈ জলে পড়ে তাঁকে স্রেফ্ অবিশ্বাসই করেছিলাম। তাঁকে এসে শ্রীঅরবিন্দ বলে গেলেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে—এই কথা শুনে আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে খানিক চুপ ক'রে থেকে শেষে বললাম—"কিন্তু"

বরদাবাবু (মুচকি হেসে)—বিশ্বাস হয় না এই তো? আপনার খুব অপরাধ নেই। তবে যা বলছি শুনুন। আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তবুও আমি যে সত্যবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি—এই না?

সত্যই আমি ভাবছিলাম তাঁর সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে—এবং প্রমাণের কথা। তাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বরদা—শুনুন তবে বলি আর একটু—এবার হয়তো বিশ্বাস হবে। আপনায় ডান দিকের তলপেটে কি হার্নিয়া আছে?

আমি (অবাক হয়ে)—আছে। টাগ অফ ওয়ার করতে রাপচার হয়। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? যোগবলে?

বরদা—কতকটা—তবে ষোল আনা নয়। কারণ শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম যোগবলে, কিন্তু একথা জানলাম তাঁর মুখে শুনেই। তিনিই বললেন দিলীপ আমাকে লিখেছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করতে। অপারেশনের পরই ওকে ডেকে নিব।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর পর আর অবিশ্বাসের পথ কৈ? শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যে অবিকল ওই কথাগুলিই লিখেছিলেন।

বরদাবাবুর মধ্যে এই যে যোগবিভূতি আমি চাক্ষুষ করেছিলাম—তার ফল আমার মনে হয়েছিল সুদূর-বিস্তীর্ণ। আরও এইজন্য যে এ অঘটনটির ভবিষ্যৎ বাণীও ফলেছিল দুবছরের মধ্যে।

বরদাবাবুর কথাবার্তার ভঙ্গী ছিল চমৎকার—গম্ভীর সদা আত্ম-সমাহিত। তাইজন্যে তাঁর যোগবিভূতি আমাকে আরও অভিভূত করেছিল—সস্তা বোলচাল তিনি দিতেন না ব'লে। তাঁর কথা পরে আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে 'যোগীদের যোগবিভূতি নানারকম থাকে।' আমি কেবল বলতে চাই যে যোগের রাজ্যে এই আমার প্রথম অঘটনের (Miracle) অভিজ্ঞতা—এ রকম অলৌকিক ঘটনা পণ্ডিচেরীতে একটিও দেখিনি।"

(৩৪ পরিচ্ছেদ ৫৯০-৯২ পৃষ্ঠা)

শ্রীদিলীপকুমার বরদাবাবু সম্বন্ধে আরও বলেছেন—"বরদাবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমন্তরা সন্দেহ করতে পারেন—বলতে পারেন যে বরদাবাবু কোনও রকমে জেনে নিয়েছিলেন আমার হার্নিয়ার কথা। কিন্তু জানবেন কি করে? আমি তাঁর কাছে যাব কোনদিন ভাবিনি—হঠাৎ গিয়ে হাজির হ'য়েছিলাম এক বন্ধুর অনুরোধে—যাকে আমি আভাস পর্যন্ত দিই নি শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এ সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন। কথা উঠতে পারে বরদাবাবু ধ্যানে জেনেছিলেন আমার রোগটা আছে। তাহলে মিথ্যা বলবেন কেন? শ্রীঅরবিন্দের মহিমা কীর্তন করার কোনও আগ্রহই তাঁর থাকবার কথা নয় যেহেতু তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলেন না। তা ছাড়া বরদাবাবু ছিলেন বেপরোয়া মানুষ। যা মুখে আসত বলে ফেলাই ছিল তাঁর স্বভাব। কখনও কখনও কেউ প্রগল্‌ভতা করলে তাকে সাজা দিতে, যোগবিভূতি দেখাতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। আমাকে বলেছিলেন—এক আত্মম্ভরী অধ্যাপক তাঁর সামনে যোগ-বিভূতিকে আষাঢ়ে গল্প বলে হাসাহাসি করায় একঘর লোকের সামনে তিনি তাঁকে ভালমানুষির সুরে প্রশ্ন করেছিলেন—"অমুক জায়গায় তাঁর গুপ্ত রক্ষিতাটি তাঁকে ছেড়ে আর একজনকে রক্ষক করল কী দুঃখে—তিনি কি তাঁকে যথেষ্ট গহনাগাঁটি দিতেন না?"

বরদাবাবুকে ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ অলৌকিক দর্শন দিয়ে আমাকে অন্য গুরুকরণ করতে বারণ করেছিলেন এইজন্য যে আমার মধ্যে এ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি তখনও জাগে নি। তাই এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে বরদাবাবুর মাধ্যমে তিনি আমাকে আমার প্রার্থিত দেশনা (Guidance) দিতেই তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে যাই হোক বরদাবাবুর কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব—তাঁর অলৌকিক দর্শনের বলিষ্ঠ অভিঘাতে আমাকে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন বলে।

এ প্রসঙ্গে আমার আরও একটি বক্তব্য আছে সেটি এই যে

বরদা বাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন বলেই তিনি আমাকে শ্রীঅরবিন্দের বাণী দেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বসে নয়। এ কথার প্রমাণ এই যে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করলেও শ্রীঅরবিন্দ বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও তাঁর বাধত না। সেদিন এবং পরে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় তিনি আমাকে বেপরোয়া হয়েই বলেছিলেন যে "শ্রীঅরবিন্দর অতিমানসিক (Supramental) দর্শন সত্যভিত্তিক হলেও এ সাধানায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন না, একটি বিশেষ কারণে।" সে কারণটি আজ আমি প্রকাশ করতে চাই না। কেবল বলব যে ১৯৫০ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ দেহ রক্ষা করলেন তখন আমার মনে পড়েছিল সর্বপ্রথম বরদা-বাবুর এই ভবিষ্যৎ বাণী, আর অনুতাপ এসেছিল তাঁর সত্যভাষণের জন্য রাগ করেছিলাম বলে। তাঁর বাণীবাহ হয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন—বলেছিলেন যে সময় হলে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে নেবেনই নেবেন, তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে ফলে নি কী?

বরদাবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় যখন বছর দশেক পরে পণ্ডিচেরী থেকে মাস কয়েকের জন্য কলকাতায় আসি। সেই সময় তিনি যখন আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করেন তখন আমি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করি কবে আমি আমার ইষ্টের দর্শন পাব? তিনি হেসে বলেছিলেন—ভুলতে পারিনি আরও এই জন্য যে কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম—"পাবে গো পাবে। তবে পণ্ডিচেরীতে নয়। এক মহীয়সী অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। তিনি যখন তোমার শিষ্যা হয়ে এসে তোমার যত বাধার জঙ্গাল সাফ্ করে দিবেন তখনই তোমার হবে বস্তুলাভ। তার আগে নয়।" আমি খুশী হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, "কিন্তু সে সুদিন আসবে তো?" বরদাবাবু জবাব দেন—"এখনও অবিশ্বাস? আমি তোমাকে যা যা বলেছিলাম ফলে নি কি?" আমি লজ্জিত হ'য়ে ক্ষমা চাইতে তিনি বল্লেন—"না গো না অজ্ঞান জানে না বলেই অবিশ্বাস করে, এতে রাগ করে যে সে জ্ঞানী নয়।"

…বরদাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম ঔৎসুক্য নিয়ে, ফিরে এলাম শুধু ভরসা পেয়েই নয় যোগশক্তির সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে।"

বরদাচরণের অলৌকিক যোগশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেও শ্রীদিলীপকুমার বিদায় নেওয়ার পুর্বে বললেন—কাশীতে গিয়ে কয়েক জন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার তাঁর ইচ্ছা আছে। বরদাচরণ তার উত্তরে বললেন "কাশীতে মহাযোগী সরকারজী ছাড়া দেখা করার মত দ্বিতীয় কেহ নাই।" দিলীপকুমার সেই মহাপুরুষের সঙ্গে বহু সাধ্যসাধনার পর সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন।—মহাপুরুষও বলেন সময় হলেই তোমার প্রার্থিত বস্তু পাবে। কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।"

দিলীপকুমার—সে সময় আপনার দেখা কোথায় পাব ?

মহাপুরুষ (হেসে)---আমার সাহায্য পেতে হলে আমার দেখা পাবার দরকার নাই। বরদা যে আমার সাহায্য পেয়েছিল সে কি আমার দেখা পেয়ে ? তোমাকে যখন তিনি আমার কাছে এসে ধর্না দিতে বললেন তখন কি তিনি বলেন নি তোমাকে যে আমি বহুদূর থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।"

দিলীপকুমার বলছেন—"এর পরও চমৎকৃত না হ'য়ে কি করি ? কারণ যোগীপুরুষ বরদাবাবু * * * আমাকে বলেছিলেন যে এই সরকারজী (লালবাবা) চিরদিনই উলঙ্গ—তিব্বতে যোগে সিদ্ধিলাভ করেন—তারপর ঘুরে ঘুরে বেড়ান—নানা যোগার্থীকে সাহায্য করেন—অনেক সময় তাদের অজান্তে—বরদাবাবুকেও সাহায্য করেছিলেন—যদিও বরদাবাবু কখনও চর্মচক্ষে তাঁকে দেখেন নি।"

"প্রধানতঃ আমি এই জন্য অবাক হয়েছিলাম যে বরদাবাবুর সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছিল লালবাবার তা জানবার কথা নয়। বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে চিন্তা করলাম 'এসব কোন জগতের কথা! বরদাবাবু সেদিন যা বললেন সেও তো এই রকমই রহস্যলোকেরই কথা। যাই হোক বরদাবাবুর কথা মেনে নিয়ে শ্রীঅভেদানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার সংকল্প ক'রে শ্রীঅরবিন্দের পথ চেয়ে রইলাম।"

উনপঞ্চাশ

বরদাচরণ ও তপস্বী দ্বারিকানাথ

যোগীরাজ বরদাচরণ তাঁর অধ্যাত্ম সাধনপথে অগ্রসর হওয়া কালে যে সব মহাপুরুষ ও উচ্চকোটির সিদ্ধসাধকগণের আধ্যাত্মিক সাহায্য এবং সাহচর্য লাভ করতে পেরেছিলেন—তদানীন্তন কালে বারাণসী ধামে অবস্থিত সরকারজী (লালবাবা) ছাড়া বর্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ড আশ্রমের সাধুবাবা তপস্বী দ্বারিকানাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

তপস্বী দ্বারিকানাথ ছিলেন উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাসাধক। আসমুদ্র হিমাচল—মানস সরোবর-কৈলাস তীর্থ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত তীর্থগুলো তিনি পর্যটন করেছিলেন।

সরকারজীর সঙ্গে বরদাচরণের কখনও চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় নি। আধ্যাত্মিক জগতে সূক্ষ্ম দেহে তাঁদের সাক্ষাৎকার হত এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। কিন্তু তপস্বী দ্বারিকানাথের সঙ্গে বরদাচরণের চাক্ষুস সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ ঘটেছে—ভাবের আধান প্রদান হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নিকটবর্তী একটি স্থানে সধুবাবার আশ্রম ছিল। বরদাচরণ লালগোলা থেকে প্রায়ই উক্ত আশ্রমে যেতেন। সমস্ত রাত ধরে সাধন সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা করে ভোরে ফিরে আসতেন।

পঞ্চাশ

বরদাচরণ সম্বন্ধে সাহিত্যিক শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

শ্রীশশাঙ্কবাবু তাঁর প্রবন্ধে বরদাচরণ সম্বন্ধে বলেছেন—

"বরদাবাবু সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু জানা ছিল। সেইটুকুই এখানে বলে রাখি। বহরমপুর কলেজে পড়ি তখন। থাকতাম মেন হোষ্টেল। বরদাবাবু মাঝে মাঝে এই হোষ্টেলে আসতেন তাঁর পুরাণ ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদেরই আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

বরদাবাবুর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় কাশীর ঐ সরকারজীর দেহের মত। বলিষ্ঠ মাংসল দেহে ছিল টক্‌টকে সোনার রং। চোখ দুটিতে ফুটত একটা শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। আর সেই দৃষ্টিতে মাখান থাকত সরল শিশুর হাসিটুকু। হ্যাঁ ব্রাহ্মণোচিত চেহারা যাকে বলে।

যোগশক্তি কিনা জানি না তবে বরদাবাবুর আত্মিক শক্তি যে প্রবল ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হেতু অভিজাত মহলের যেমন তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন তেমনি বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গেও ছিল তাঁর অতীব প্রিয় সম্পর্ক।

১৯২৪ সাল। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণের বড় ইচ্ছা স্বয়ং উপাচার্য এসে যদি তাঁর স্কুলের বার্ষিক

পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন তবে তাঁর স্কুলের জৌলুষ বাড়ে। তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা বরদাবাবুর কাছে প্রকাশ করেন। বরদাবাবু বলেন—"তাঁর জন্যে মহারাজের কিছু চিন্তা নাই—তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।" বরদাবাবুর অনুরোধ উপাচার্য উপেক্ষা করতে পারলেন না—তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

কথাটা রটে গেল—আশুবাবু যাচ্ছেন অমুক দিন মফঃস্বলে লালগোলা স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণে। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের নাম তখন কে না জানে। অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তিনি ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী। অন্যান্য ধনবান ব্যক্তির মত তিনি ভোগ লালসায় মত্ত ছিলেন না। বেশভূষায় ছিল না কোনও পারিপাট্য অতি সরল সাধারণ জীবন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহু প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান ছিল প্রচুর। এহেন দানবীরের স্কুলে আশুবাবু যাচ্ছেন নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকষ্ট যেমন লেগেই আছে তখনও তেমনি ছিল। সুতরাং আমাদের মত অনেকেই তখন ভেবেছিলেন কোন্ না লাখ টাকা আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করে আনবেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি আশুবাবু লালগোলায় পদার্পণ করে স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করলেন। প্রত্যাশিত দানের কোনও খবরই পাওয়া গেল না। আশুতোষবাবু কোনও সর্তে আসেন নি। এসেছিলেন বরদাবাবুর প্রতি প্রীতিবশতঃ।"

(বারবেলার বৈঠক—যুগান্তর সাময়িকী)

উপরোক্ত পারিতোষিক বিতরণী সভার দর্শকরূপে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নিজের কানেই শুনেছি উপাচার্য স্যার আশুতোষ বরদাচরণের জ্ঞানগর্ভ, সুললিত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "বরদাবাবুর মত কৃতবিদ্য জাত-শিক্ষকের দ্বারাই কেবল দেশের এবং জাতির গৌরব বৃদ্ধি পেতে পারে।" দেখেছি তাঁর নিজের গলার মালা খুলে বরদাচরণের গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করতে।

সাহিত্যিক শশাঙ্কবাবু আরও বলেছেন :—"প্রবোধ সান্ন্যালের মুখে শুনেছি আমাদের আর একজন সাহিত্যিক বন্ধু একবার বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। দীর্ঘ বলিষ্ঠ এবং সুন্দর সুশ্রী, এই বন্ধুর চেহারা। আলাপের পর কিছুক্ষণ এই বন্ধুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—'আঃ কী চমৎকার এই নাভি পর্যন্ত।' নিজের নাভি হাতে স্পর্শ করে একথা বললেন। 'সব ঠিক আছে—কিন্তু ঐ নাভির নীচেই যত গোলমাল। ঐ দিক্‌টা যদি একটু মোড় ফিরত তবে হ'ত সোনা।'" (বারবেলার বৈঠক—যুগান্তর সাময়িকী)

একান্ন

বরদাচরণ ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত।

যোগীরাজ বরদাচরণের আধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে বিজড়িত অনুরাগী ও অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অমলেন্দু দাশগুপ্ত একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। অমলেন্দু দাশগুপ্ত (বরদাচরণের প্রিয় ইন্দুভায়া) ছিলেন তাঁর অনুরাগীগণের মধ্যে অন্যতম।

অমলেন্দু দাশগুপ্তের অপূর্ব জীবনের যে সামান্যতম বিবরণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম—স্মৃতির অতলান্তগর্ভ থেকে সেইটুকু উদ্ধার করে পাঠকগণের সম্মুখে তুলে ধরলাম।

অমলেন্দুবাবু পূর্ববঙ্গের (অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার এক গ্রামের অধিবাসী।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বালেশ্বর যুদ্ধের নায়ক বীর বিপ্লবী যতীন মুখার্জির (বাঘা যতীন) একনিষ্ঠ সহযোদ্ধা সিংহশিশু নীরেন দাশগুপ্ত যে বংশের সন্তান অমলেন্দু দাশগুপ্তও সেই বংশোদ্ভব। নীরেন্দ্র ১৯১৫ ৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানী প্রেরিত অস্ত্র বোঝাই জাহাজ খালাস করতে গিয়ে উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে আহত হয়ে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছিলেন।

১৯২১ সাল। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী রূপে আসন্ন পরীক্ষার জন্যে অমলেন্দু প্রস্তুত হচ্ছেন। এদিকে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বুক

জুড়ে বেজে উঠল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের রণদুন্দুভি। পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার জন্যে চিহ্নিত বালক জাতীয় আন্দোলনের আহ্বানে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভুলে গেল সকলের সদুপদেশ। ভুলে গেল নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দিনগুলোর স্বপ্ন। এ যে তার বংশের ঐতিহ্য। বিপ্লবী সংস্কার নিয়েই যে তার জন্ম। তার রক্তে বিপ্লবের বিষাণধ্বনি বেজে উঠাই যে স্বাভাবিক। সমাজ আর দেশের সেদিনের পরিবেশ তাঁর বিপ্লবী সত্তাকে টেনে বের করে এনেছিল অন্তরের গভীরতম তলদেশ থেকে। স্বাধীনতার শপথ নিয়ে, মাদারীপুরের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তাই তাঁর বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি।

তারপর অনেক ঘটনা, অনেক অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল অনেকগুলো দিন। বাংলার বুকের গঙ্গা পদ্মা দিয়ে ব'য়ে গেল অনেক জল। বিদ্যালয় পরিত্যাগে রাজনৈতিক জীবনের যে অধ্যায়ের সূচনা—তার পরিসমাপ্তি ঘটল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্যে।

পরবর্তী অধ্যায়ে নোয়াখালী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. পাস করার পর ১৯৫২ সালে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হলেন।

এই সময় বিপ্লবীনেতা পূর্ণচন্দ্র দাস এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিদ্রোহী চারণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী। বিপ্লবী রূপে অমলেন্দুবাবু তখন শাসক শক্তির কাছে চিহ্নিত। বাহির থেকে উপরোক্ত নেতাদের সাথে যোগাযোগের সন্দেহে তিনিও ধৃত হন এবং জেলে প্রেরিত হন। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হল না। তিনি মুক্তি পেলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। বৈপ্লবিক কর্মতৎপতার ইতিহাসে এক অভিনব এবং চমকপ্রদ অধ্যায়। ঐ আকস্মিক চরম আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক বৃটিশ পশুরাজ সন্ত্রস্ত

হয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে বেড়াজাল ফেলেছিল। রুই, কাতলা, চুনো-পুঁটি উঠেছিল অনেক। অমলেন্দবাবুও সেই জালের ফাঁক গলিয়ে পালাতে পারেন নি। কারাগারে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান।

সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। সূচনা হল দ্বিতীয় জীবন—সাহিত্যিক জীবনের। আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিলেন। কারা প্রাচীরের অন্তরালের অখণ্ড অবসরে বেদ উপনিষদাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর এই সাহিত্যিক সত্তা। এর মধ্যে তিনি তৃপ্তি পান নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মন যেন চলে যেতো কোথায় কোন এক অজানা অব্যক্ত অদৃশ্য মহাসত্তার পানে। স্বস্তি কিছুতেই পেতেন না। সেই কৈশোর সীমান্তে সে সত্তা একবার মনের মাঝে ক্ষণিকের দোলা দিয়ে গিয়েছিল। ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দেয় নি। মনের মণিকোঠায় লুকোনো সেই সত্তার দিকেই মন যেন সব সময় ছুটে যেতে যায়—সেই সত্তা তাঁর তৃতীয় জীবন, অধ্যাত্ম সত্তা। এই সত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্যক্ বিকাশ ঘটল যোগীরাজ বরদাচরণের সংস্পর্শে এসে। তাঁর কাছে পথের কড়ি সংগ্রহ করে অমলেন্দুবাবু এ পথে—তাঁর তৃতীয় জীবন পথে—অধ্যাত্ম পথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

যোগীরাজের সংস্পর্শ এবং সাহচর্যে অমলেন্দুবাবু পেয়েছিলেন এক অনাস্বাদিত পূর্ব নূতন কল্পরাজ্যের সন্ধান। এ যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম। অমলেন্দুবাবু নিজেই বলেছেন :—

"১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর কাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কাজী তখন বাইরে কোথায় যাচ্ছেন। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে প্রশ্নের বান ডাকিয়ে দিলেন—যেন আমার উত্তরের কোন প্রয়োজনই তার নাই। টন্‌তে টান্‌তে একেবারে তার গাড়ির মধ্যে—"চল"

আমি—কোথায় ?

কাজী—চল তো। এক মহাপুরুষ দেখাব।

আমি—মহাপুরুষ ? সে আবার কি বস্তু ?

কাজী—মহাযোগী। ওখানেই যাচ্ছি।

আমি—সন্ন্যাসীবাবা না কি ?

আমার কথায় কবি তাঁর স্বভাব সিদ্ধ আকাশ ফাটান হাসি হেসে বললেন, "আরে না না! তোমার আমার মতই গৃহস্থ মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার। নাম বরদাচরণ মজুমদার। কবি জোড় হাতে প্রণাম করলেন উদ্দেশে। এঁরই কাছে কাজী দীক্ষা নিয়েছেন সে খবরও জানলাম। মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগল। গৃহস্থ মানুষ—ছেলে মেয়েও আছে—চাকরিও করেন। এরকম মানুষ মহাযোগী হন কি ক'রে ? এটা কাজীর কবি মনের অত্যুক্তি নয় তো ? যোগী—গুহাগহ্বরে থাকবে বনে-জঙ্গলে—কৌপীন সম্বল ক'রে জটাজুট ধারণ করবে, এতকাল এই তো জেনে এসেছি। কিন্তু হায় তখন কি জানতাম—একালেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম কিছু মহাযোগী আমাদেরই মত গৃহী।

ভবানীপুর মল্লিক বাড়িতে এসে গাড়ি দাঁড়াল। বাড়ির প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে দুখানি নেম প্লেটে লেখা ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিক অপর পাশে ডাঃ প্রভাসচন্দ্র মল্লিক। কাজী হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দোতলার করিডোরের সামনে। এক সুবেশ তরুণ ডাক্তার অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আসুন কাজীদা।

কাজী—দাদা ঘরে ?

ডাঃ—"হ্যাঁ ঘরেই আছেন। যান। আমি চলি কাজীদা চেম্বারে যাচ্ছি।" নিচে নেমে গেলেন। জানলাম ইনিই ডাঃ প্রভাসচন্দ্র মল্লিক, ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিকের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র। একটা বড় হলঘরে আমরা প্রবেশ করলাম।

ঘরখানির ঠিক মধ্যেখানে একটা বড় পালঙ্ক। রাস্তার দিকে

জানালার পাশে মেঝেতে বড় ফরাশ। ঐ ফরাশে ফতুয়া গায়ে হুঁকো হাতে এক ভদ্রলোক তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে রয়েছেন। জানালা দুটি দিয়ে ফরাশের উপর রোদ এসে পড়ছে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, "এস কাজীভায়া" চোখ কিন্তু আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ। দৃষ্টিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা।

কাজী প্রণাম ক'রে উঠতেই আমি প্রণাম করলাম। কাজী আমার পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোক নিজের পাশটিতে আমার জায়গা নির্দেশ করে বললেন, 'বসুন'। বসলাম।

এইবার তাঁর দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দৈর্ঘ্যে অনুমান ৬ ফুটেরও কিছু বেশী। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণোচিত চেহারা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এর কোনটাই তো সংসারে অপ্রতুল নয়। আমাদেরই মত একজন মানুষ তো। বৈশিষ্ট্য বলতে যা চোখে পড়ল তা তাঁর চোখ দুটির দৃষ্টি। সে দৃষ্টি অতি শান্ত এবং শিশুর চোখের মতই স্বচ্ছ আর নীলাভ। এ ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব আমার চোখে ধরা পড়ল না। একটা রুমালে নাক ঝাড়লেন। বললাম—"সর্দি হয়েছে?" বললেন—"হ্যাঁ, সারারাত পাখাটা খোলা ছিল তাই।"

মনের মধ্যে আবার জিজ্ঞাসার উঁকিঝুঁকি—প্রশ্নের ঝড়। যোগী-দেরও তাহলে সর্দি হয়?" হ্যাঁ হয়। পরবর্তী জীবনে জেনেছি যোগসিদ্ধ দেহেও রোগ হয়। তাঁকে সেদিন সর্দিতে আক্রান্ত দেখে সত্যিই তাঁর যোগশক্তি সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা আমার হয়েছিল। কত ভুল ধারণা ও মতবাদই যে আমরা পোষণ করি! সেদিন যোগীদের সম্বন্ধে আমার কত ভুল ধারণাই না ছিল।

প্রথম দিনের আলাপেই বরদাবাবু আমাকে একেবারে আপনজনের মতই গ্রহণ করলেন। নজরুলকে তিনি 'কাজীভায়া' বলে ডাকতেন—আর আমার নামের আদ্য অংশটা ছেঁটে ফেলে প্রথম দিনেই আমার নামকরণ করলেন "ইন্দুভায়া"। আমার সঙ্গে

দেখা হওয়ার পর তিনি বছর তিনেক মত মরলোকে ছিলেন। ১৯৪০ সালের ১৮ই নভেম্বর ৫৩।৫৪ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে স্বধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

তিনি বহুবার কলকাতা এসেছেন। যতবারই এসেছেন আমার সাথে প্রায় প্রত্যহই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি যোগ সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষাই আমাকে দেন নি—দীক্ষা তো দূরের কথা। কাজী একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে বলেছিলেন দাদা! অমলকে কিছু করতে বললে না কেন? বরদাবাবু শান্ত স্বরে বললেন—"না, দরকার নাই।" কি ভেবে বলেছিলেন তা তিনিই জানেন, তবে আমার এতে দুঃখ কিছু হয় নি। আসন, প্রাণায়াম্ ইত্যাদির আমি বিরোধীই ছিলাম। ব্রহ্মকল্প মহাপুরুষ কি আমার মনের ভাব বুঝেই ওকথা বলেছিলেন? তবু বরদাবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় ছিল।

বরদাবাবুর যোগশক্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বহু বহু প্রমাণ পেয়েছি। শ্রীঅরবিন্দও মন্তব্য করেছেন—

"Greatest Yogi of Modern Bengal"*.

পরবর্তীকালে বরদাবাবু সম্বন্ধে সংসারত্যাগী—জনসমাজের বাইরে অবস্থিত সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের অভিমত জেনেছি। তাঁরা বলেন, "বরদা যোগের একটা নতুন পন্থা আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।" এতে যে কতখানি সম্মান ব্যক্ত হয়েছে—যোগ সম্বন্ধে যাঁরা একটু খবরাখবর রাখেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন।

একদিন বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম যোগী বর্তমানে কে ?

বরদা—সরকারজী।

অমল—কই নাম তো শুনিনি কোনদিন। কে ইনি ?

বরদা—আগের শরীরে ইনি ছিলেন সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকোর গুরু লালবাবা। এবারকার শরীরে সরকারজী।

আগের শরীর, এবারের শরীর ইত্যাদি কথায় ব্যাপারটা যেন কেমন একটু জটিল ও রহস্যাবৃত বলে মনে হল। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন :—

বরদা—লালবাবার শরীরটা সাত শত বছর রেখে পরে ছেড়ে দিয়ে সরকারজীর শরীর গ্রহণ করেন। যুক্তপ্রদেশের এক ক্ষত্রিয় রাজার ছেলের শরীর এটি। ছেলেটি দেহত্যাগ করলে তিনি সেই শরীরে প্রবেশ করেন। শ্মশান থেকেই সংসার ত্যাগ করেন। বিরাট দেহ। পশ্চিমা পালোয়ানই বলতে পার।

অমল—আপনি কি এঁরই কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন ?

বরদা—না, আমি কারও কাছেই দীক্ষা নিই নি। (একটু থেমে) আমি স্বপ্নে শিবদীক্ষা পেয়েছি—তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম—অল্পবয়স।

অমল—সরকারজীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ?

বরদা—চাক্ষুষ দেখা কোনই দিনও হয় নি। তবে তাঁর কথা আমি জানি। (কাজীকে সম্বোধন করে বললেন) দেখ কাজী ভায়া একদিন ধ্যানে বসেছি কোনও একটা বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে। বলেই ফেলি—ইচ্ছা ছিল আজ শিবের কাছে অষ্ট সিদ্ধি চাইব। শিবের সাক্ষাৎ পেলাম—বললেন কী চাস্। কিন্তু যা চাইব ভেবেছিলাম তা আর চাওয়া হল না।

নজরুল কোনও প্রশ্নই করলেন না। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, "কেন চাওয়া হল না।"

বরদাবাবু বললেন—দেখি শিব ও আমার মাঝের জায়গায় আমার দিকে পিছন ফিরে কে এক মহাপুরুষ বসে আছেন। শিবের প্রশ্নের জবাবে আমার প্রার্থনা জানাব এমন সময় তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে এমন কি ছিল জানিনা—কিন্তু তাঁর সম্মুখে অষ্টসিদ্ধির লোভ প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হল। তাই আর তা চাইতে পারলাম না।

অমল—ঐ মহাপুরুষটি কে?

বরদা—ইনিই সরকারজী। শিবের সঙ্গে পাশাপাশি বসবার শক্তি ও অধিকার আর কার হতে পারে। (দেশ পত্রিকা ৭।৬।৫৬)

তিরোধানের পূর্বে বরদাবাবু যখন শেষবার কলকাতায় আসেন তখন একদিন আমাকে ডেকে বললেন—"ইন্দু ভায়া! তুমি না একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম যোগী বর্তমানে কে?

অমল—হ্যাঁ, আপনিতো সেকথা সেই দিনই বলেছিলেন যে সরকারজীই ভারতের শ্রেষ্ঠতম যোগী।

বরদা—"হ্যাঁ বলেছিলাম। শোন খবর আছে!" এই কথা বলে এমনভাবে তাকালেন যে উপস্থিত সকলেই আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

অমল—কি খবর?

বরদা—সরকারজী আবার নূতন দেহ নিয়েছেন।

আমরা যে কয়জন উপস্থিত ছিলাম চোখে মুখে প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বরদাবাবু বলে যেতে লাগলেন:—

"এবার গ্রামে থাকৃতে একদিন হঠাৎ কেন জানিনা সরকারজীর কথা মনে এল। ধ্যানে তাঁর অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলাম। অবশেষে ধ্যান পথে বাংলাদেশের গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে দেখি যে গঙ্গার তীরবর্তী বাঙালী ব্রাহ্মণের দেহে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন। পূর্ব দেহটি পরিত্যাগ করেছেন। আর আমি অগ্রসর হই নি কাজেই ঠিক কোন গ্রামে কোন বংশের ব্রাহ্মণ পরিবারে কোন দেহে সরকার-

প্রবেশ করেছেন তা আমি এখন বলতে পারছি না। তবে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবার তিনি বাঙালীদেহ ধারণ করেছেন এবং কি খেলা যে খেলবেন তা কেবল তিনিই জানেন।" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, "ইন্দু ভায়া—খোঁজে থেকো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে।"

মহাপুরুষ বরদাচরণের মুখে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম।" (দেশ পত্রিকা)

বাহান্ন

বরদাচরণ ও রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ রায়।

বরদাচরণের অনুরাগীগণের মধ্যে রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন একজন জিজ্ঞাসু ভক্ত। তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চ শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। কলকাতারই অধিবাসী। বরদাচরণের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। বরদাচরণ কলকাতা গেলেই রায়সাহেব সন্ধ্যায় এসে তাঁর সঙ্গে নানাপ্রকার ধর্মালোচনা করতেন। কিছু কিছু জানতেও চাইতেন।

বরদাচরণের সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদানও ছিল। অনেক গভীর বিষয় তিনি পত্রে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরিশিষ্ট খণ্ডে তাঁর একখানি পত্রের অনুলিপি থেকে দেখা যাবে বরদাচরণের প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ তিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করতেন। বরদাচরণের "দ্বাদশ বাণী" গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রকাশন বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে রায়সাহেব মহাযোগী সরকারজীর অঘটনী প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য যোগীরাজকে অনুরোধ করেন। যোগীরাজ বলতে আরম্ভ করলেন মহাযোগী সরকারজীর এক বিস্ময়কর অলৌকিক যোগশক্তির অতি অদ্ভুত বিবরণ।

"অনন্যসাধারণ এই মহাসাধকের কাণ্ডকারখানাই ছিল পৃথক।

রূপ রূপান্তর ধরে এযাবৎ কত খেলাই যে খেলে আসছেন। ঐ শিবতুল্য যোগীকে যুগ যুগ ধরে ভারতের কত সাধক যে গুরুরূপে মেনে এসেছেন তার আর ইয়ত্তা নাই। বাবা বিশ্বনাথ তো স্থাণু হয়ে রয়েছেন আর উদোম উলঙ্গ বিশ্বনাথ মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সম্বন্ধে কাশীতে এই উক্তি প্রচলিত ছিল যে কাশীতে দুই বিশ্বনাথ। একটি মন্দিরে অচল। দ্বিতীয়টি ত্রৈলিঙ্গ স্বামী সচল। যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন—"স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ এঁর শরীর আশ্রয় করে অবস্থিত।"

একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে এই সচল শিব বসে আছেন, এমন সময় সেখানে এলেন সরকারজী। পরস্পর চোখোচোখি হতেই রতনে রতন চিনলেন। উভয়ের মুখেই ফুটে উঠল এক অপার্থিব স্বর্গীয় দ্যুতি। সচল শিব ত্রৈলিঙ্গ স্বামী তাঁকে বললেন, "এদিকে এস"। সরকারজী তাঁর সম্মুখে যেতেই বললেন—"পা তোল—মাথায় রাখো।" সরকারজী তাঁর মাথায় ডান পাখানি তুলে ধরতেই ত্রৈলিঙ্গ স্বামী দুই হাতে পাখানি ধরে সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র ও বন্দনা সমাপ্ত করলেন। সরকারজীকে প্রণাম করার এই ছিল সচল শিব ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিজস্ব প্রণালী। এহেন মহামানব সরকারজী।"

যোগীরাজ বলে চললেন—সেই মহাযোগী সরকারজীর এক অলৌকিক অঘটনী প্রতিভার কথা। ঠিক যেন এক কুহকীর কুহক।

"একদিন—কী যে তাঁর খেয়াল কে জানে—এলাহাবাদের এক খ্যাতনামা বাঙালী আইনজীবীর বাড়ির ফটকে সহসা এসে উঠলেন। বিরাট দেহী উলঙ্গ সন্ন্যাসী চান অন্দরে প্রবেশ করতে। দরোয়ান তাতে রাজী নয়। এই দৃশ্য আইনজীবীর বৃদ্ধা মাতার চোখে পড়ে। তিনি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে সাধুর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তাঁর পুত্র এডভোকেট সাহেবও আসেন। এই দৃশ্য কয়েক জন পথচারীকেও আকৃষ্ট করে।

সরকারজীর বাহিরের রূপটি ভয়াবহ হলেও একটা শান্ত শ্রীমণ্ডিত ছিল। ভয় হলেও ভক্তিতে মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ত। হাজার হাজার বছরের এটা সংস্কার। অধ্যাত্ম সাধনার প্রাণকেন্দ্র ভারতে এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এটাই এদের বৈশিষ্ট্য।

পুত্র মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা, সাধুজী কি তোমার চেনা?" মা বললেন, "না বাবা, এই প্রথম দেখছি।" সাধুজী তখন মায়ের মুখের পানে চেয়ে হাসছেন—কী শিশুর মত বিমল হাসি—সে হাসির কোন তুলনা হয় না। যেন যুগ যুগান্তর, জন্মজন্মান্তর ধরে চেনা জানা। বৃদ্ধা মাতা সাধুজীকে বিনয় সহকারে অনুরোধ জানালেন—"বাবা, দয়া ক'রে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন এখানেই যা হয় দুটো আহার ক'রে যাবেন।"

সাধুজী মায়ের কথায় সম্মত হলেন।

বরদাচরণ ভক্ত মণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, এইবার শোন সেই খেয়ালীর অঘটনী শক্তির খেলা। হঠাৎ দারোয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে টেনে উঠাও।" তখন মেঝের উপর বসে পড়েছেন।

ভীত দারোয়ান সঙ্কোচের সঙ্গে এগিয়ে এল। প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা ক'রেও বিন্দুমাত্র নড়াতে পারল না। যেন হিমালয় পাহাড়। সাধুজী ডাক দিলেন বাগানের মালিকে। সে একক তো নয়ই দুজনে চেষ্টা ক'রেও অকৃতকার্য হল। ডাক পড়ল বাড়ির দুই ভৃত্যের সবশেষে চারজনে মিলেও সেই অচলায়তনকে বিন্দুমাত্রও সচল করতে পারল না। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্।

এডভোকেট সাহেবের ছেলেমেয়ে এবং ভাগ্নী—সব কটিই ৭।৮ বছরের—দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে এই মজার খেলা দেখছিল। মুখে তাদের বিমল হাসি। তাদেরই মত অনাবিল হাসি মুখে তাদের ডেকে সাধুজী বললেন—"আও ইধার। ও লোক সব আদমী নেহি।"

শিশু চারটি নির্ভয়ে এগিয়ে এল সাধুজীর একেবারে কাছে।

ভয়ের কোনও চিহ্নমাত্র নাই ওদের চোখে মুখে। যেন খেলার সাথী ওদের ডাকছে।

ছেলে ছুটির কাঁধে উঠে বসলেন। মেয়ে ছুটির কাঁধে দুই হাত রেখে বললেন, "চল্ চল্-হেট্ হেট্"। ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন—"ওদের নিয়ে কোথায় চললেন বাবা?"

সাধু—আহার করতে হবে তো। গঙ্গা স্নানটা সেরে আসি।

মাতা পুত্র পিছন পিছন চললেন। চোখে মুখে ভয় ও বিস্ময়। অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষের এ আবার কি খেলা।

চারটি শিশুর স্কন্ধে এক বিরাট ঐরাবত। অথচ শিশুকয়টিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পাথিব পালক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই অভূতপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য এলাহাবাদের রাস্তায় ভিড় জমিয়ে দিল।

যখন গঙ্গার ধারে পৌঁছে গেছেন তখন এডভোকেটবাবু ভীতস্বরে চিৎকার ক'রে ছিলেন "শিশুদের নিয়ে চললেন কোথায়? আমাদের বাঁচান বাবা।"

ভ্রূক্ষেপশূন্য মহামানব বাচ্চাদের তখন বলছেন "চল্ চল্ হেট্ হেট্।" এমন মজার একটা খেলা পেয়ে বাচ্চাদের উৎসাহের অন্ত নাই। তারা একেবারে মাঝ গঙ্গায় গিয়ে হাজির। উপরে দাঁড়িয়ে এডভোকেট-বাবুর কাতর আর্তনাদ—বৃদ্ধা মাতার চোখে অঝোর ধারা। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্।

মাঝগঙ্গায় পৌঁছে হঠাৎ ঝপ ক'রে জলে পড়ে সাধু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই উঠে আবার বাচ্চাদের কাঁধে বসে বললেন, "চল্ চল্ হেট্ হেট্"। বাচ্চারা মহাউৎসাহে ফিরে চলল ঘরে। কিন্তু কী অলৌকিক কাণ্ড। মাঝগঙ্গায় গিয়েও বাচ্চাদের হাঁটুর উপরে জল উঠল না।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য কে কবে দেখেছে। এতো ম্যাজিক নয়। এক বিপুল জনতা এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখেছে। অথচ এ আশ্চর্য অঘটন সকলেরই ধারণার বাইরে।

বাড়ি ফিরে এলেন সাধু ঐ অবস্থায়। বাচ্চাদের কী আনন্দ। বুড়িমা সাধুজীর অনুমতি নিয়ে আহারের ব্যবস্থায় গেলেন।

দোতলার একটা প্রকাণ্ড হলঘর। সেই ঘরেই সাধুবাবার আহারের ঠাঁই হয়েছে। সাধুবাবা সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। সকলকে চলে যেতে আর দরজা বন্ধ ক'রে দিতে বললেন।

নানা প্রকার আহার্য পরিপূর্ণ থালা নিয়ে বুড়ি মা এবং আর সকলে সাধুবাবাকে ভোজন করাতে এলেন। দরজা খুলে দেখেন— পাখি উড়ে গেছে।

এমনি খেলা খেলতেন খেয়ালী মহাপুরুষ সরকারজী।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বরদাচরণ বললেন—"দেখ এসব ব্যাপারের অর্থ সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। মনে হয় সমস্তটাই যেন হেঁয়ালী। কিন্তু না, তা নয়। এরও তাৎপর্য আছে। বৃদ্ধার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই এবং আতিথ্যের প্রতিদানও ঠিকই দিয়ে গেছেন। বাইরে তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। বুড়িমার ঘর থেকে অন্তর্হিতও হলেন সত্যি। কিন্তু বৃদ্ধাকে দিয়ে গেলেন নীরবে তাঁর বীজমন্ত্র। বৃদ্ধা নিরাশ হন নি। পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

সাধুবাবা সূক্ষ্মদেহে যাওয়া আসা করতেন। আর যাকে যা দেবার এইভাবেই দিতেন। পরের দেহে আবার কি খেলা খেলবেন তা তিনিই জানেন।

(দেশ পত্রিকা)

তিপ্পান্ন

বরদাচরণ ও কাজী নজরুল ইসলাম।

বরদাচরণের বহুবর্ণাঢ্য জীবনালেখ্যে আর একটা বিশিষ্ট বর্ণের তুলির রেখা না টানলে ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে রেখা তাঁর বড় আদরের 'কাজী ভায়া'। কাজী নজরুল ইসলাম। বরদাচরণের অধ্যাত্ম জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে নন্দনকানন গড়ে উঠেছিল কাজী নজরুল ছিলেন সেই কাননে পুষ্পিত পারিজাত।

সুধী সমাজে কাজী নজরুলের পরিচয় দিতে যাওয়া বাতুলতা। তাছাড়া তাঁর বিচিত্র, কর্মবহুল সংঘাতময় জীবনের ছবি এখানে দেওয়াও সম্ভব নয়। যতটুকু তাঁর মুখে তাঁর পাশে বসে শুনেছি এবং জেনেছি তা "বিদ্রোহী চারণ কবি" গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। বরদাচরণের সঙ্গে তাঁর জীবনের যে অংশটা জড়িত এখানে শুধু সেইটুকুই দিলাম।

কবি কাজী নজরুলকে প্রথম দেখি নিমতিতা গ্রামের জমিদার বাড়ির এক বিয়ের আসরে। নিমতিতার জমিদার রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীবাহাদুরের কন্যার বিবাহ হয় এলাহাবাদের ভূতপূর্ব এড্‌ভোকেট, কলকাতা নিবাসী যতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের সঙ্গে। কাজী নজরুল ইসলাম সেই বিবাহে বরযাত্রীদলের সঙ্গে এসেছিলেন। নজরুল প্রতিভার সঙ্গে যতীশবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি কাজী সাহেবের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

নজরুল ইসলাম সে সময় বাংলার যুবা মনে অত্যুগ্র দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই তিনি এসেছেন জেনে যুবকরা হয়ে উঠেছিল উৎসাহিত। দলে দলে ছুটে গিয়েছিল নিমতিতা ভবনে তাঁকে দেখতে।

ঐ বিবাহ সভাতেই কাজী সাহেবও বরদাচরণের প্রথম দেখা পান। বরদাচরণ লালগোলা থেকে এসেছিলেন কন্যাপক্ষের আমন্ত্রণে। এই সাক্ষাতের কথাই কাজী নজরুল বরদাচরণের 'পথহারার পথ' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় উল্লেখ ক'রে গেছেন।

বলেছেন "নিমতিতা গ্রামের এক বিবাহ সভায় সকলেই বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয় সুন্দর সারথীকে। সেই বিবাহ সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তাহার চিরজীবনের সাথীকে বরণ করিল। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি হইতেছে—স্রক্-চন্দনের শুচি সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে। নহবতে সানাই বাজিতেছে। এমনি শুভক্ষণে আনন্দ বাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম। তিনি এই গ্রন্থগীতার উদ্‌গাতা শ্রীশ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়।"

কিছুদিন পর অকস্মাৎ। কবির সংসারে নেমে এল নিদারুণ মর্মান্তিক বিপর্যয়। কালের নির্মম আঘাতে স্বভাব চঞ্চল, চিরহাস্য পরিহাস মুখর কবি বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর অতি আদরের পুত্র 'বুলবুল' দারুণ বসন্ত রোগে সহসা মহাকাল সমুদ্রের অতলান্ত গভীরে হারিয়ে গেল। ব্যথাহত কবি বাইরে স্তব্ধীভূত, নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু বাইরের প্রচণ্ড ঝড় তাঁর অন্তরাকাশে গিয়ে সেখানে একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি ক'রে তাঁকে যেন একেবারে ভেঙে চুরে দিয়ে গেল। সেই দারুণ দুর্দিনে নিরুপায় কবি শক্তির প্রত্যাশায় ছুটে গেলেন লালগোলায় তাঁরই কাছে, যাকে তাঁর আত্মা বরণ ক'রে নিয়েছিল তার জীবন রথের সারথীরূপে নিমতিতার সেই বিবাহ বাসরে।

মানুষের জীবনে এটাই স্বাভাবিক। মানুষ যতদিন জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকে, ততদিন অধ্যাত্মরাজ্যের কথা তার মনের কোণে উদয় হয় না। সেই সময় কোনও প্রিয়জন চোখের আড়ালে চলে গেলে ব্যথাস্তব্ধ হৃদয়ে বাইরের যত কলকোলাহল এককালীন থেমে যায়। তখন সেই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্যে মন ছুটে যেতে চায় কোনও অজানা—অচেনা কল্পরাজ্যে—সেই অধ্যাত্ম জগতে। দুঃখের আঁধারেই দুঃখহারী দেন দীক্ষা।

সেদিনের বিবাহ সভায় কবির এই তৃতীয় জীবনের অর্থাৎ অধ্যাত্ম সত্তার পূর্বরাগের যে সূচনা—এই মিলনেই সেই জীবনের সূত্রপাত।

শোকসন্তপ্ত পিতা বরদাচরণকে সমস্ত ঘটনা বললেন। জানতে চাইলেন কিসে সান্ত্বনা আসে। কিসে শান্তি পাওয়া যায়।

যোগীরাজ কবিকে অনেক ক'রে বোঝালেন, অনেক উপদেশ দিলেন। যদিও তিনি জানেন :—

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হ'তে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে, অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে।
সে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখ বেদনায়।"

বাহিরের সান্ত্বনায় অন্তর তো শান্ত হয় না। বাইরের ঝড় থেমে গেলেও ভিতরের আলোড়ন বন্ধ হয় না। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাণ যখন নিজের ভাণ্ডার খুলে সান্ত্বনার অমৃতকণা ছড়িয়ে দেয় তখনই মানুষ পায় সান্ত্বনা। হয় শান্ত। সব সান্ত্বনার দ্বার বন্ধ হলে হৃদয় এক

আনন্দলোকের সন্ধান পায়। সেই আনন্দ আপন পরিপূর্ণতায় মানুষকে ভুলিয়ে দেয় শোক, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার তীব্র জ্বালা।

কবি কথঞ্চিৎ শান্ত হলে তখন যোগীরাজ তাঁকে দেখিয়ে দিলেন অপ্রমেয়, অনাবিল শাশ্বত শান্তির পথের নিশানা। দিলেন অন্তরের মণিকোঠার চাবিকাঠি। কিন্তু সারাজীবনের নিত্য সঙ্গী স্নেহ, মায়া, মমতার শক্ত বাঁধন ছেঁড়া তো সহজসাধ্য নয়। তাই কবি অতি বিনীত-ভাবে বললেন—"ছেলেটিকে একবার দেখার অদম্য ইচ্ছা কিছুতেই দমন করতে পারছি না। কিন্তু বিগত আত্মা কি আর স্থূল দেহে ফিরে আসতে পারে?"

পিতৃ হৃদয়ের আকুল আকুতি মানবপ্রেমিক মহামানবের সংবেদনশীল মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি বিস্ময়কর অঘটনী শক্তির খেলা দেখিয়ে কবির মনকে আত্মস্থ করলেন। অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন—"ছেলেকে দেখার খুবই ইচ্ছা হচ্ছে? বেশ, দেখতে তুমি পাবে। কিন্তু দেখো, কোনও কথা তুমি তাকে বোলো না।" কবি সম্মত হয়ে স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

একটা মাসও অতীত হয় নি। হঠাৎ একদিন সকালে কবি লালগোলায় এসে যোগীরাজের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন—"আপনারই কৃপায় ছেলের দেখা আমি পেয়েছি। আমার মন এখন শান্ত হয়েছে।" ছেলেটির দেখা পাওয়ার অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে বললেন—একদিন কবি তাঁর উপাসনা কক্ষে বসে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ ক'রে চলেছেন; একটা কচি পায়ের শব্দে তাঁর একাগ্রতা ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলেন তাঁর আদরের বুলবুল ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে তার পোশাক পরিচ্ছদ খেলনায় ভরা আলমারিটি খুলে সব নেড়ে চেড়ে দেখল। আলমারিটি বন্ধ করল। তারপর স্তম্ভিত, শোকাহত পিতার মুখের পানে চেয়ে একটা মৃদু পরিচিত হাসি উপহার দিয়ে বুলবুল্ সে ঘর থেকে উড়ে গেল।

উল্লিখিত ঘটনার ইঙ্গিতও কবি সেই ভূমিকার মধ্যেই দিয়েছেন।

বলেছেন—"ধর্মরাজ আমার হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন, যাঁকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ সভায় ধ্যানে বাসিয়া আবিষ্টের মত বাইশ বার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষ বার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন।"

কলকাতায় বরদাচরণের আরও বহু অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। স্কুল বন্ধ হলেই তিনি কলকাতা যেতেন। কবি সে সময় রোজ সকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে আসতেন, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হত, অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান ক'রে নিতেন।

বরদাচরণ ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত। তাই তাঁকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেবার জন্যে কবির চেষ্টার অন্ত ছিল না। রোজ সন্ধ্যায় একজন ক'রে সঙ্গীতশিল্পীকে সঙ্গে ক'রে আনতেন। নামী নামী শিল্পী ভবানীপুর মল্লিক বাড়িতে অনেকেই এসেছেন। বরদাচরণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, সঙ্গীত সুধা পরিবেশন ক'রে সকলকে পরিতৃপ্ত করেছেন। মুর্শিদাবাদের নামী শিল্পী মঞ্জুমিঞা সাহেবকেও একদিন কবি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মঞ্জুমিঞা তখন লালবাগের বাস (মুর্শিদাবাদ) তুলে দিয়ে কলকাতা মেটেবুরুজে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। তিনি যোগীরাজের পূর্ব পরিচিত।

যোগীরাজ কিন্তু কবিকণ্ঠের গানেরই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ ভাবপ্রধান সঙ্গীতই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। কবি যে খুব সুকণ্ঠ ছিলেন তা নয়। তবে তাঁর স্বরচিত গান নিজের সুরে তাঁর কণ্ঠে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। কবির বাস ভাবরাজ্যে। তাঁর গলায় গানও তাই ভাবপ্রবণ শ্রোতাদের কাছে ছিল অতি উপাদেয়। কবির দরদী কণ্ঠে এমন একটি উপচার ছিল যার দ্বারা তিনি তাঁর গানের ভাবটিকে ভাবুক শ্রোতার মনের পটে মূর্ত ক'রে তুলতেন। তাই নামী নামী কালোয়াৎ—খেয়ালীদের গান শেষে কবিকে গান গাইতে হোত যোগীরাজের ইচ্ছায়। আর গুরুর আদেশ পাওয়া মাত্রই কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে

দিয়ে গাইতে আরম্ভ করতেন। কবির স্বরচিত "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা" গানখানি ছিল যোগীরাজের অত্যন্ত প্রিয়। প্রায়ই ওখানা শুনতে চাইতেন। তিরোধান দিবসেও ওই গান শুনিয়েই তাঁকে চির বিদায় দিতে হয়েছিল।

কাজী নজরুল অত্যন্ত বন্ধু বৎসল ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে মল্লিকবাড়ি এলেন। যোগীরাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আমার এই বন্ধুটি জিজ্ঞাসু। যোগমার্গ সম্বন্ধে ইনি কিছু জানতে চান।"

বরদাচরণ বন্ধুটির দিকে চেয়ে বললেন, "কি জানতে চান বলুন।"

বন্ধু—যোগমার্গ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে। দু-চারটি বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করেছি। তাঁরা সবাই আমাকে নিরাশ করেছেন। বলেন, যোগমার্গ খুবই শক্ত। সংসারে থেকে ও সম্ভব নয়। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে নাকি ওপথে যাওয়া যায় না। কিন্তু—

যোগীরাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিঃশব্দ হাসি হেসে কবির মুখপানে একবার চেয়ে বন্ধুটিকে বললেন—"কিন্তু আমাকে দেখছেন আমি পরিপূর্ণ গৃহী। আপনার বন্ধুও তাই। কেমন না?

বন্ধু—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বক্তব্যও তাই। আপনারা কেউ তো সংসার ছাড়েন নি।

যোগীরাজ (সহাস্যে)—আর কামিনীকাঞ্চনও না।

বন্ধু—তা হ'লে ওঁরা সব ওকথা বলেন কেন?

যোগীরাজ—বলেন, জানেন না ওকথার অর্থ তাই বলেন। কামিনীকাঞ্চন শব্দে টাকা পয়সা ও স্ত্রী ধারণাটাই স্বাভাবিক। তবে সেটা সাংসারিকক্ষেত্রে। কিন্তু প্রসঙ্গ যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রের, তখন জ্ঞান দৃষ্টিতে ওর অর্থ চিন্তা করতে হবে। জ্ঞানদৃষ্টিতে কামিনী অর্থে আসক্তি, আর কাঞ্চন অর্থে মায়া। আসক্তি আর মায়া ত্যাগ না করলে ছাই-ভস্ম মেখে লোটা কম্বল নিয়ে বনে বসে থাকলেও কিছুই হবে না। ভস্মে ঘি ঢালাই সার হবে। আমাদের শাস্ত্রে কি বলেছে? "ভার্য্যাহীনে

ক্রিয়া নাস্তি, সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ।" পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র নিজে আচরণ ক'রে এ কথার সত্যতা প্রমাণ ক'রে যান নি কি? সীতাকেও বনবাস দিয়েও স্বর্ণসীতা গ'ড়ে নিয়ে যজ্ঞ করতে হয়েছিল। আমাদের পৌরাণিক যুগেও দেখুন অনেক মুনি ঋষি স্ত্রী পুত্র নিয়েই বাস করতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রচুর কাঞ্চনও ছিল। তারপর ভাবুন পিতা ও মাতার দেহ থেকেই আমাদের এই দেহ উৎপন্ন। তাহলে কামিনীর সংস্পর্শ আপনি ত্যাগ করবেন কি ক'রে? আবার দেখুন বেঁচে থাকতে হলে আহার্য বস্তু চাই। সে বস্তুও কাঞ্চন পর্যায়ভুক্ত। যারই বিনিময় আছে তাই কাঞ্চন। তাই সাংসারিক জীবনে ও দুটো ত্যাগ করা দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ। কিন্তু ও দুটোর উপরে যে অত্যাজ্য আস্পৃহা, যে কামনা সেটা তো ত্যাগ করতেই হবে।

বন্ধু—কামনা বা কামই মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে অবশে চালিয়ে নিয়ে যেতে এর জুড়ি কেউ নাই। এই দুর্মদ কামকে ত্যাগ করার উপায় কি?

যোগীরাজ—উপায় নাই। ত্যাগ আপনি করতে পারেন না। কামাদি ষড়রিপু এই দেহকে আশ্রয় ক'রেই রয়েছে। এদের স্থান নাভি থেকে দুই পায়ের মধ্যে। কি ক'রে ত্যাগ করবেন? কাজেই ওগুলোর গতি পরিবর্তন ক'রে নিতে হবে। কামকে—প্রেমে; ক্রোধকে—রাগে অর্থাৎ অনুরাগে পরিবর্তিত করতে পারলে দেখবেন 'কামিনী' তখন আর 'বাঘিনী' নয়। 'কামিনী' তখন মহাশক্তির শাক্ত্যাংশরূপিণী। সে 'কামিনী' সাধন ভজনের বাধা হয়ে তো দাঁড়ায়ই না, বরং সাধন-সহায়িকাই হয়। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই সাধনপথের পথিক হলে পরস্পরের সাহায্যে অনতিকাল মধ্যেই দ্বিদলে স্পন্দন লাভ করা যায়।

বন্ধু—যোগপথে এগিয়ে যেতে গেলে কিভাবে প্রস্তুত হতে হয়।

যোগীরাজ—দেহ এবং মন দুটিরই শুচিতা রক্ষা করতে হবে।

সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ, সৎকর্ম এসবগুলোই শুচিতা রক্ষার সহায়ক। স্থির জলেই যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে তেমনি স্থির মনেই সত্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। ধৈর্য সাধনমার্গে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান সহায়ক। অধৈর্য হয়ে পড়লে সবই নষ্ট। কাজেই ধৈর্য অভ্যাস করতে হবে। আর একটি অঙ্গ অধ্যবসায়। রোজ নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় ক্রিয়া ক'রে যাওয়া।

বন্ধু—প্রাণায়াম বোধ হয় খুব শক্ত?

যোগীরাজ—বিশেষ ক'রে যাদের ক্ষয়মান দেহ তাদের পক্ষে প্রাণায়ামের একটা অঙ্গ কুম্ভক বা বায়ুরোধ করা সুফলদায়ক নয়। প্রাণায়াম ব্রহ্মচর্য সাপেক্ষ। তবে সহজভাবে বায়ুরোধ না ক'রেও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা রয়েছে।

বন্ধু—আচ্ছা! বাহ্য পূজার মাধ্যমে কি ইষ্ট লাভ হয় না?

যোগীরাজ—আত্মপ্রতারণা না ক'রে কর্মের অনুষ্ঠান করলে ইষ্ট-লাভ অবশ্যই হয়। সমস্ত কর্মেরই মূল প্রবর্তক ঈশ্বর। কর্মের মধ্যে কর্মের মূল প্রবর্তক ঈশ্বরানুসন্ধান-বুদ্ধি মিলিয়ে নিয়ে কর্ম করলে—সে কর্মের মাধ্যমে ইষ্টলাভ অবশ্যই হবে।

কবিবন্ধু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। বরদাচরণ তাঁর 'কাজী ভায়া'কে গান গাইতে বললেন। গুরু সমর্পিত প্রাণ শিষ্য তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণের সমাহিতভাবে গান ধরলেন—

"হে মাধব! হে মাধব! হে মাধব!
তোমারেই প্রাণের বেদনা কব
তোমারই শরণ লব।"

চুয়ান্ন

দুরারোগ্য ডায়েবিটিস্ সেই সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-চাপ-বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হয়ে বরদাচরণ দীর্ঘকাল ধরেই কষ্টভোগ করছিলেন। এই অসুস্থতার মধ্যেই সহসা একদিন দুর্দিনের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে এল। তাঁর স্নেহময়ী জননী মাতঙ্গিনী দেবী এক কালরাত্রিতে পরস্পরের ডাক শুনতে পেলেন। এ ডাক মায়া মমতা প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়ে রোধ করা যায় না। পুত্র, পুত্রবধূ পৌত্র-পৌত্রী আত্মীয়-স্বজনে সাজান সংসার পিছন ফেলে রেখে তাঁকে যাত্রা করতে হল অজানার ডাকে অচেনা দেশের পথে। পরিণত বয়সের শেষ মুহূর্ত্তটি পর্যন্ত সুখে কাটিয়ে সকলের অশ্রুধারাসিক্ত হয়ে ১৩৪১ সালের ৩রা পৌষ মাতঙ্গিনী দেবী সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

মাতৃ বিয়োগের পর থেকেই বরদাচরণের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্থানীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর অভিমত, রোগ জটিলতর এবং সঙ্কটজনক অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁরা সকলে একমত হয়ে উন্নততর চিকিৎসার জন্যে কলকাতা নিয়ে যাওয়ারই পরামর্শ দিলেন। বরদাচরণ নিজেও কলকাতা ক্রীক্ রো নিবাসী, ইউরোপ প্রত্যাগত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ কিরণেন্দু ঘোষ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডাঃ ঘোষ সপরিবারেই বরদাচরণের অনুরাগী ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁর মত প্রবীণ এবং বহুদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিক

মহাশয়ের সপরিবার অকুণ্ঠ সেবাযত্নে ক্রমে ক্রমে একটু সুস্থ ও সবল হওয়ার পর লালগোলা ফিরে এলেন। চিকিৎসকদের নির্দেশ রইল মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে তাদের পরামর্শ ও ব্যবস্থা নিয়ে আসতে হবে। এইভাবেই চলতে থাকল।

এদিকে তাঁর কর্মক্ষেত্র লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমিতে তাঁর এই সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এক স্বার্থান্বেষী ভণ্ড, চাটুকার সহকর্মী—যিনি একদা বরদাচরণের কাছে বহু উপকার পেয়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের কানে তাঁর সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা নানা রকমের বিষ ঢেলে কিছু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। সহকর্মীটির এই ষড়যন্ত্রের পিছনের প্রচ্ছন্ন কারণ উপলব্ধি করতে দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন মহাসাধকের বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় নি। তিনি তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং ব্যক্তিত্বের সুতীক্ষ্ণ সায়কে সেই ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন করে পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান ক'রে ফেললেন।. কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করতেও বিন্দুমাত্র দেরী করলেন না। তাঁকে পদত্যাপ পত্র প্রত্যাহার করানর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন উপরোধ অনুরোধ করেছিলেন। নিজেদের ভুল ত্রুটিও স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্পে ছিলেন অটল অচল। তাঁর তেজস্বিতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা ও নির্ভীক। অর্থ অপেক্ষা আত্মসম্মানের মূল্য তাঁর কাছে ছিল অনেক বেশী। যেখানে আত্মমর্যাদার অপচয় সম্ভাবনা আছে বুঝতেন, সেখানে থাকার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ১৭ বৎসর শিক্ষকতা করার পর লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের কর্মভার পরিত্যাগ করলেন।

বরদাচরণ তখন কেবলমাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষকই নন। তিনি তখন নব্য বাংলার মহাযোগীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর যশো-সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অধ্যাত্ম এবং যোগজীবনের

পুণ্যবাণীতে কেবলমাত্র ছাত্রসমাজই নয়—বিদ্যামন্দির বহির্ভূত সহস্রের হৃদয়কে ক'রে তুলেছেন অধীর। তখন তিনি লোকশিক্ষক —আচার্য —গুরুরূপে খ্যাত। ভূত, ভবিষ্যৎ তখন তাঁর দিব্যদৃষ্টির সীমায়ত্ত। সতত প্রকাশমান অনন্ত বিশ্ব বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত সত্যের স্বরূপ-দ্যুতি যেন তাঁর নেত্র যুগলে নিয়ত বিদ্যমান। বরদাচরণের এই যশোগরিমা লালগোলা স্কুলে থাকাকালীনই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বরদাচরণের পদত্যাগের সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হয়ে পড়তে বিলম্ব হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিজ নিজ স্কুলে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পর নানা কারণে তিনি তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তাঁরা ব্যর্থ হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন। অবশেষে ১৯৩৭ সালের ৭ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত বাড়ালা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীতপেশচন্দ্র পাণ্ডে এবং সেক্রেটরী শ্রীকমলাপতি চ্যাটার্জি মহাশয় লালগোলা বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং বরদাচরণকে বাড়ালা হাই স্কুলে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁদের সঙ্গে নানারকম আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেখানে রেক্টর হিসাবে কর্মে যোগদানে সম্মত হন।

১৯৩৭ সালের শেষভাগে তিনি সেখানে কাজে যোগদান করেন। স্কুল কমিটি তাঁর আহার ও বাসস্থানের সমস্ত সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর সেবা-পরিচর্যার জন্য একজন পৃথক সাহায্যকারীরও ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ালা গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ তাঁর কাছে যেতেন। ধর্মতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চস্তরের আলোচনা হত। স্বাস্থ্যটাও একটু একটু করে ভালর দিকেই চলেছিল। এইভাবে মাস চার পাঁচ ভালোয় ভালোয় কেটে গেল।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগেই সহসা একদিন তিনি ঐ স্কুলেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এই তাঁর প্রথম স্ট্রোক্—স্কুল কমিটির সভ্যগণ, সহকর্মিগণ, স্থানীয় বন্ধু-বান্ধব এবং ছাত্রমণ্ডলীর অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ সেবা সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসায় কিছু সুস্থ হলেন। তারপর বললেন যে বাড়ি কাঞ্চনতলায় আসবেন। তাঁর ইচ্ছামত কয়েকজন ছাত্র তাঁকে কাঞ্চনতলার বাড়িতে রেখে গেল। সেদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী।

১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা ট্রেনে লালগোলা থেকে তাঁর পরিবার-বর্গ কাঞ্চনতলায় এসে পড়লেন। সুচিকিৎসা এবং যথাযোগ্য 'সেবা পরিচর্যা সেই সঙ্গে আবাল্য বন্ধু ও সতীর্থদের সাহচর্যে ক্রমশঃ সুস্থতার দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলেন। দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন আর অনুরাগী অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী এবং সহকর্মীরাও অনেকে এলেন। এখন অনেকটা সুস্থ।

তাঁর এই আকস্মিক অসুস্থতায় জানিনা কেন আমার মনের আকাশ জুড়ে সন্দেহের একটা কালমেঘ দেখা দিয়েছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এটা কি শিবকল্প মহাযোগীর লীলাবসানের সূচনা? স্বধামে ফিরে যাওয়ার সময় কি তবে আসন্ন? আমার এই সন্দেহে ইন্ধন যোগাল তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্যগুলো শেষ করে ফেলার আকস্মিক তৎপরতা। কনিষ্ঠ কন্যাটির বিবাহসংস্কার শেষ করে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা ইতিপূর্বেই প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লালগোলা না গেলে এ-সম্বন্ধে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চনতলায় আসন্ন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্মিণী অমিয়া দেবী বিপুল অর্থব্যয়ে বরদাচরণেরই নির্দেশে ঐ মন্দির নির্মাণ করেছেন। বরদাচরণ উপস্থিত না থাকলে প্রতিষ্ঠানুষ্ঠান পণ্ড হবে। সমস্ত পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব যে যোগীরাজ নিজেই নিয়েছেন। কাজেই মন্দির প্রতিষ্ঠার

দিন নিজেই স্থির ক'রে দিলেন ২৪শে চৈত্র, ইংরাজী ৭ই এপ্রিল ১৯৩৮ সাল।

নির্ধারিত দিনে কাশী থেকে নিজের পরিচিত এবং মনোনীত কয়েকজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে আনয়ন করলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে এলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ভক্ত শচীনন্দন গোস্বামী; কলকাতা থেকে আনালেন তাঁর সাধক বন্ধু এবং ভক্ত স্বামী রামদাস আচারিয়াকে; মুর্শিদাবাদ শ্রীরামপুর থেকে অন্তরঙ্গ ভক্ত এলেন বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক কালিপদ ভট্টাচার্য। এঁরা সকলেই মন্দির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। আর এলেন নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। মহা আড়ম্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সমাপ্ত হয়ে গেল। কয়েক দিন বিশ্রামের পর বৈশাখের মাঝামাঝি পরিবার-বর্গকে পাঠিয়ে দিলেন লালগোলায়। এখানকার বৈষয়িক কাজকর্মের সুবন্দোবস্ত করে ৮ই জ্যৈষ্ঠ নিজের লালগোলায় যাওয়ার দিন স্থির করলেন।

কাঞ্চনতলা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর বড় একটা ছিল না। কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে সে কথা বলেও ফেললেন :—

"দেখ জীবনের বাকী দিনগুলো এখানে কাটানরই ইচ্ছা ছিল। পিতৃপুরুষের ভিটা, গঙ্গার তীর, তার উপর এখানে ঐ শিবমন্দির স্থাপনের মূলেও সেই ইচ্ছা। থাকতে পেলে হয়ত আরও কিছুদিন থাকতাম। কিন্তু তা হবার নয়। অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছাই সব সময়ে প্রবল। জোর ক'রে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করার নাই। যেখানে যা প্রয়োজন ঠিক সময় মত তিনি তা ক'রে যাচ্ছেন। মানুষ উপলক্ষ মাত্র।"

স্বেচ্ছাধীন মহামানব— জানিনা তাঁর ইচ্ছা কিনা—তবে লালগোলা পৌছানর পর মাত্র কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই দ্বিতীয় পুত্রটিরও বিবাহ স্থির ক'রে ফেললেন। দুটি বিয়েরই দিন ধার্য হল ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৫ সাল।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আস্‌ছে সারা দেশজোড়া বন্যাও তত

বেশী ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। ১৩৪৫ সালের বান যে ১২৮৬ সালের ভীষণ বানের চাইতেও অনেক বেশী ব্যাপক ও ভয়াল, প্রত্যক্ষদর্শীরা সে কথা বলেন। ঐ পরিস্থিতির মধ্যেই দুই বিয়েই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। দেখতে পেলাম তাঁর মুখে চোখে কর্তব্য-সমাপনের প্রফুল্লতা—একটা আনন্দের দিব্যদ্যুতি। বললেন, "এবার আমি সব কর্তব্য মুক্ত।"

সন্দেহের কালো ছায়াটা মনের আকাশে ঘনতর হয়ে এল। অনুমান আমার মিথ্যা নয়। মহামানবের লীলা সংবরণের ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠছে।

পঞ্চান্ন

পুত্র কন্যার বিয়ের জের তখনও মেটে নি। হঠাৎ একদিন কাজী নজরুল ইসলামের একখানা টেলিগ্রাম এল। তাঁর স্ত্রীর জীবন সংশয় অসুখ। অবিলম্বে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। গুরু সমর্পিত প্রাণ শিষ্যের আকুল আহ্বানে ভক্তানুরাগী, শিষ্যবৎসল মহাপ্রাণ গুরু সাড়া না দিয়ে পারেন নি নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা ক'রেও ছুটে গিয়েছিলেন রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে। কবিপত্নী মনে পেয়েছিলেন বল। বুকে সাহস। সংকট মুহূর্ত উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ফিরে এসেছিলেন জীবনের পথে। মল্লিকবাড়িতে আবার আরম্ভ হল ভক্ত সমাগম। চলতে লাগল ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা।

একদিন এলেন নলিনীকান্ত সরকার। কাজী সাহেবের সঙ্গে। সে সময় নলিনীবাবু আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে কাজ করেন। মল্লিকবাড়ির সেই হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যোগীরাজ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘকাল পরে দেখা। কত কথা—অতীতের কত গল্প—কত আলোচনা। যেন একটা আনন্দের জোয়ার এল। আরম্ভ হল গান। নলিনীবাবু কয়েকখানি গান শোনালেন। কাজী সাহেবও। গান শেষ হল। নলিনীবাবু পরদিন (২৩ সেপ্টেম্বর) যোগীরাজকে তাঁর বাসায় (১৯২ আপার সার্কুলার রোড ৪র্থ তল ৩নং ফ্ল্যাট) আমন্ত্রণ জানালেন। বরদাচরণ সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ছাপান্ন

নির্দিষ্ট সময়ে নলিনীবাবুর বাসায় গিয়ে দেখা গেল আমন্ত্রিত গণের মধ্যে রয়েছেন দিলীপকুমার, উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি।

উপেন্দ্রবাবু—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নিযুগের মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ, প্রখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুসাহিত্যিক এবং সমালোচক, 'নির্বাসিতের' আত্মকথা, 'ঊনপঞ্চাশীর' লেখক। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন অত্যন্ত রসিক পুরুষ। গভীর অর্থব্যঞ্জক চিন্তার বিষয়বস্তুও তিনি লঘু চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে হাস্য পরিহাসের সুরে প্রকাশ করতেন। অমানসিক যন্ত্রণাদায়ক সুদীর্ঘ বারটি বছর আন্দামান সেলুলার জেলে কাটিয়ে এসেও সে ক্ষমতা তার হ্রাস পায় নি। সেদিনও তিনি হাস্যরসের তুফান তুলে সকলকে মাতিয়ে তুললেন। স্বভাবোচিত সরসভঙ্গীতে তাঁর অতীত বন্দী জীবনের বহু গল্প শোনালেন।

বরদাচরণের আগ্রহে দিলীপকুমারও কয়েকখানি গান গেয়ে শোনালেন। সব শেষে যোগীরাজ শুনতে চাইলেন তাঁর মুখে তাঁরই গান "জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে" গানখানি। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে কত দরদ দিয়ে যে গানখানি শোনালেন—মনে হল যেন এক অপার্থিব আন্তর প্রেরণা নিয়েই গানখানি গাইলেন। বরদাচরণ তখন আত্মসমাহিত।

সাতান্ন

কার কি স্বধর্ম ধ্যানযোগে দেখতে পাওয়ার শক্তি বরদাচরণের ছিল। নলিনীবাবুরই এক বৈষ্ণব বন্ধুও সেদিন সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। যোগীরাজকে দেখা এবং তাঁর মুখে কিছু শোনার উদ্দেশ্যে। নলিনীবাবু যোগীরাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—যে তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্যে এসেছেন।

বরদাচরণ তাঁর অন্তর-সন্ধানী দৃষ্টিতে বৈষ্ণব বন্ধুর মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—আপনি শিবভক্ত!

বন্ধু—আজ্ঞে না।

বরদা—শিবানুরাগী আপনি নন?

বন্ধু (মৃদু হেসে)—আমি বৈষ্ণব।

বরদা—আদিদেব শঙ্করের ভক্ত বা অনুরাগী কোনও দিনই ছিলেন না?

বন্ধু—ছিলাম। ছোটবেলায়। আমার একটি শিবও ছিল।

বরদা—আপনার বাড়িতে বিগ্রহ আছে নিশ্চয়ই?

বন্ধু—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

বরদা—ছোটবেলার সেই শিবটি কোথায়? কাকে দিলেন?

বন্ধু—না দিই নি তো কাউকে। সেটিও ঐ বিগ্রহের সিংহাসনেই রেখেছি।

বরদা—ছেলে বয়সের সেই শিবকে আজ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসেও ত্যাগ করতে পারেন নি। টেনে নিয়েই বেড়াচ্ছেন। বিগ্রহের সিংহাসনে তাঁকে রেখেছেন। রাধাকৃষ্ণের পুজোতেই তাঁরও পুজো হয়ে যাচ্ছে। হবেই তো। রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তি যে অভেদ। আপনি আপনার আবাল্যের শিবটিকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে বাইরে বৈষ্ণব সেজে রয়েছেন। তবু বলবেন আপনি শিবভক্ত নন শৈব নন।

বন্ধুটি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেন।

আরম্ভ হল ভগবৎ তত্ত্বালোচনা, যোগরহস্যের অপূর্ব ব্যাখ্যা। যোগরাজ্যের অনুভূতিলব্ধ কত কত বিচিত্র, অশ্রুতপূর্ব'তথ্য যোগীরাজ পরিবেশন করলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঅরবিন্দের কথাও এসে পড়ল। এসে পড়ল তাঁর অতি মানসিক (suparmental) দর্শনের কথা। আলোচনা প্রসঙ্গে সহসা স্পষ্টভাষী ও নির্ভীক বরদাচরণ বললেন যে, "অতিমানসিক দর্শন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশেষ কোনও একটি কারণে এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি করতে পারবেন না।" সমবেত সকলেই এ কথায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। দিলীপকুমার হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। একথা দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে লিখে গেছেন। এবং পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানে পর যোগীরাজের এই ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ ক'রে এবং তা সত্যে পরিণত হতে দেখে তাঁর প্রতি অহেতুক উষ্মার জন্যে তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যোগীরাজ বরদাচরণের ওই বেপরোয়া বিরুদ্ধ সমালোচনায় ঘরের আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে হয়ে পড়েছিল। কোন সূত্র ধরে নূতন আলোচনা আরম্ভ করা যাবে কেউ স্থির করতে পারছেন না। কেমন যেন একটা অস্বস্তিময় নিশ্চল জড়ীভূত অবস্থা। কাজী নজরুলই প্রথম সে নীরবতা ভাঙলেন। যোগীরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"দাদা! জন্মমৃত্যু পথে জীবের বার বার যাওয়া আসার মূলে নিজের শাশ্বত স্বরূপেরই সন্ধান করা তো?"

যোগীরাজ—হ্যাঁ তাই। তবে শুধু সন্ধান করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না ভায়া। তার সঙ্গে মিলন চাই। মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জীব এই ভুলের দেশে এসেছে। মহামতি কবীর বলেছেন— "প্যাস অহদ্‌কী সথ হম্ লায়ে, মিলন করনেকো আয়ে।" বুড়ি ছুঁতে হবে গো। বুঝেছ? না ছোঁয়া পর্যন্ত এই লুকোচুরি খেলা শেষ হবে না। যাওয়া আসা বা জন্ম মৃত্যুর পথেই চলছে জীবনের পরিক্রমা। জাগতিক খণ্ড খণ্ড সত্যগুলো সব এক মহাসত্যের দিকে, মহাধ্রুবের পানে এগিয়ে চলেছে। চলেছে জন্ম জন্মান্তর, রূপ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই অভিসারের নিবৃত্তি নাই। পরম দয়িত যে অবিরাম হাতছানি দিচ্ছেন— অবিরাম ডাকছেন তাঁর সাথে মিলিত হতে যেমন বৃন্দাবনের শ্যামল কিশোর গোপকিশোরীদের আহ্বান জানাতেন বাঁশীর সুরে। তাইতো জীবমাত্রেই অভিসারিকা। সবাই ছুটে চলেছে পরমপ্রীতমের সঙ্গে মিলিত হতে। নদী যেমন ছুটে চলে মহাসাগরের পানে।

কাজী—আমরা তাহলে তাঁর খেলার সাথী?

বরদা—ঠিক তাই। আমরা সেই বিরাট শিশুর খেলার সঙ্গী। না জেনেই তাঁর খেলা পুষ্টি করে চলেছি। সজাগ হয়ে খেলতে পারার জন্যেই সাধনা। না হলে অজানাভাবেই খেলতে খেলতে একদিন না একদিন আপনা থেকেই সজাগ হয়ে খেলার সুযোগ এসে যাবে। সেদিন বুঝব যে খেলছেন স্বয়ং ভগবান। তিনিই খেলার কারণ তিনিই সব। নিজেকে নিয়েই তিনি খেলা করছেন।

বরদাচরণের জীবনের দুটো দিক দেখা যায়। একটা তাঁর বহিরঙ্গ জীবন, অপরটি অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, কর্তব্যনিষ্ঠ সংসারী, সদানন্দময় আদর্শ পুরুষ। বহিরঙ্গে তিনি সর্বদা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টাই করতেন। আর

অন্তরঙ্গে ছিলেন মহাযোগী, মহাতাপস, মহাসাধক। অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় কেবল তাঁর অন্তরঙ্গগণই পেয়েছিলেন।

যোগীরাজের জীবনের অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ সাধ্যাতীত। তাই তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি বলেই পরিসমাপ্তি টানবো।

"তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।······
নাই সময়ের পদধ্বনি
নিরন্ত মুহূর্তে স্থির দণ্ড পল কিছুই না গণি
নাই আলো নাই অন্ধকার
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।

* * *

তোমাতে সমস্ত লীন তুমি আছ একা
আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।"

আটান্ন

সেই ক্ষণজন্মা মহামানবের প্রাণরসে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতম দিনগুলোকে ঘিরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে একটা চিরনিরুত্তর—চির-নির্বাক-বধির যবনিকা। অলস মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে সমাপ্তির কৃষ্ণ আবরণ। শেষ হতে চলেছে আরব্ধ জীবন নাটকের শেষ গান—

"শেষ করে দাও শেষ গান—তার পরে যাই চ'লে।
ভুলে যেও এই রজনী—রজনী ভোর হ'লে।"

ভুলে যায়। ভুলিয়েই দেয়। প্রতিটি নব প্রভাতে, পিছনে ফেলে আসা দিনটিকে ভুলে যাওয়াই বুঝি মানুষের একটা ধর্ম। কিন্তু ভোলা কি সত্যিই যায়? যাকে ভুলব সর্বাগ্রে সেই কি মনের পটে উজ্জ্বলতম হয়ে ফুটে উঠে না? মনে হয় না কি যে গত দিনটিতেও যে আমাদের মাঝে জীবন্ত সত্যরূপে, জীবনের সবটা জুড়ে বসে ছিল—যার সত্তা—যার অস্তিত্ব ছিল প্রত্যক্ষ—সে আজ কোথায়? কত দূরে? কোন অদৃশ্য অব্যক্ত লোকে? চোখ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। পরেও পাবে না। সদাপ্রসন্ন নয়নে আর তিনি চাইবেন না। সুধা নিস্যন্দী কণ্ঠস্বরে আর গাইবেন না অমরার গীতি। গভীর বেদনাময় অপূরণীয় এই ক্ষতি সয়েও জীবন তো স্বাভাবিক গতিতেই চলছে! কিন্তু সে জীবনে নেই আনন্দের উচ্ছলিত দিনগুলো গতিছন্দ।

ভুলিয়েই দেয়। ভুলিয়ে দেওয়াটাই কালের বিধান। কালধর্মে ভুলে আছি এটাও সত্য। ভুলতে হয়েছে। কিন্তু এ কেমন ভোলা?

"তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল
অন্য মনে চলি পথে—ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।" (বলাকা)

এ জীবন সত্তার মূল-দেশেই তো তাঁর অস্তিত্ব। মূলের রসপুষ্ট শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্পের মত এ জীবনটাও সেই মূল সত্তার রস-সঞ্চারে সঞ্জীবিত। তাঁকে ভোলা তো প্রশ্নের অতীত।

জানি, যাওয়া আসাই বিধির নির্বন্ধ। যে এসেছে তাকে যেতেই হবে। সময় হলেই সে চলে যাবে। তাকে ধরে রাখা যাবে না। রাখা যায় না। সে চলেই যায়। মানুষ জেনেই হোক আর না-জেনেই হোক এগিয়ে চলেছে অনন্তের অভিমুখে। উত্থান পতনের আবর্তনে আবর্তিত হতে হতে সেই মহান 'একের' অভিমুখে। অনন্তই তার পরমগতি—চরম পরিণতি। অনন্তের সঙ্গেই তার অবিনশ্বর সম্বন্ধ। মানুষ মহা-জীবন পথের অভিযাত্রী। চলেছে কোন অব্যক্ত, অদৃশ্য মহাজীবনের সাগরসঙ্গমে মিলিত হতে।

বত্রিশটি শীত গ্রীষ্ম অতীত হয়ে গেল। মৃত্যুজনিত শোক এখন সেই মহামানবের স্মৃতির উপাসনায় রূপান্তরিত। যাঁকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না—যাঁর কথা কানে আসছে না—তাঁর মূর্তিটি হৃদয় সিংহাসনে স্থাপন ক'রে সেই অ-দেখা রূপের নিরন্তর ধ্যান করা—

কালকুক্ষীগত রূপকে আরাধনা শক্তিতে জাগিয়ে তোলা। এ মিলন ভাব জগতের মিলন। এ মহামিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। হারানর ভয় নাই। রূপ এখন ভাবে রূপায়িত। আজ তাঁর বিচ্ছেদের দিনগুলোর স্মৃতি মন্থন করতে তাই কোনও ভয়াবহতা মনের উপর ছায়াপাত করছে না। সেগুলো যেন সায়ন্তনের দিগন্ত প্রসারিত কোমল রক্তিমাভার মত সমস্ত জীবন সত্তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে। আসন্ন তিমির রজনীর জন্য নেই কোনও উদ্বেগ। রয়েছে কেবল একটা বিষাদসিক্ত আনন্দাস্বাদ।

উনষাট

দেহের ভারসাম্য ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছিলেন। দীর্ঘ দেহটি চলা ফেরার সময় যেন টলমল করত। কোথাও বেশী যাতায়াত করতেন না। ঘরে বসেই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করতেন। এ অবস্থাতেও আর্ত—জিজ্ঞাসুর কামাই ছিল না। বিমুখ তিনি কাকেও করেন নি।

কুশল জিজ্ঞাসা নিয়ে রোজই কোনও না কোনও ভক্তের চিঠি আসত। তাঁর চিকিৎসক বন্ধু এবং ভক্ত ডাঃ কিরণ ঘোষ এবং ডাঃ প্রভাস মল্লিককে প্রতি সপ্তাহেই অবস্থার বিবরণ পাঠাতে হত। এই ভাবেই চলছিল।

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি হঠাৎ শরীরটা আবার বিকল হয়ে পড়ল। সাব্যস্ত হল কলকাতা যাওয়া। ২৪ শে মার্চ ১৯৪০ সাল তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হল। চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, অনুরাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে মাসাধিক কাল আনন্দ সম্মিলন শেষ করে ৩০শে এপ্রিল লালগোলায় ফিরে এলেন। এই তাঁর মরজীবনের শেষ আনন্দ সম্মিলনী। শেষ কলকাতা যাওয়া। এই সময়েই তাঁর গ্রন্থগীতা 'দ্বাদশ বাণী' মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয়। কিন্তু সে গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ তিনি চর্মচক্ষে দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর তিরোধানের পর ১৯৪২ সালের জুন মাসে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

লালগোলা ফিরে আসার পর মাস কয়েক মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। এই সময়টা আমার পারিবারিক প্রয়োজনে আমাকে আমার স্বগৃহে থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম।

ষাট

১৯৪৭ সালের ৯ই কার্তিক। ইংরাজী ২৬শে অক্টোবর ১৯৪০ সাল।

সন্ধ্যায় লালগোলা থেকে লোক এল। অসুখ হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে। বার বার শুধ্ আমাকেই খোঁজ করছেন। এই লোকই একেবারে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। ঠিক হল আগামী প্রাতেই সপরিবারে রওনা হব।

এ-যে আমার কত বড় সৌভাগ্যের কথা তা কেবল আমিই বুঝি। আত্মার পরম আত্মীয় সেই মহামানবের চিরবিদায় লগ্নে তাঁর স্নেহ-ভাজন আরও যোগ্যতর, আরও উৎকণ্ঠিত, আরও সেবাপরায়ণ অনেকেই তাঁর পাশে ছিলেন তবু আমার মত অকিঞ্চন, অপাত্রের প্রতি তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও করুণা—এ আমার জন্ম জন্মান্তরের অর্জিত কর্মফল। এই কয়টি দিনের স্মৃতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। অকিঞ্চিৎকর জীবনের বাকী দিনগুলোকে ক'রে রাখবে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ—দিবে মহৎ মর্যাদা।

একষট্টি

১০ই কার্তিক। ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় সপরিবারে লালগোলা পৌঁছে বাড়ি ঢোকার মুখেই যোগীরাজের প্রতিবেশী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ চক্রবর্তী আমাকে বললেন—"তুমি পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে যাও। রোগী অত্যন্ত দুর্বল। তার উপর তোমার জন্যে উৎগ্রীব হয়ে রয়েছেন। সহসা সম্মুখে গেলে আনন্দের আতিশয্যে Strain হতে পারে। তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। তুমি অপেক্ষা কর আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।" চিকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করা যায় না। তাঁর পরামর্শ মতই ভেতরে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারবাবুও আমার কাছে এসে বললেন—"আমাদের ডাক্তারী বিদ্যা এখানে অচল। তোমাকে বৃথাই এ-পথে ঘোরালাম।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বলুন তো ?" ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি ঘরে যেতেই আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—"ডাক্তার! মিছে তুমি ওকে ওদিক দিয়ে পাঠালে। ওকে ডাক! ওকেই আমার এ সময় বেশী প্রয়োজন।"

ঘরে ঢুকে তাঁর পাশেই বসেছিলাম। চোখের জলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। উদ্গত ক্রন্দনবেগ কণ্ঠরোধ করেছিল। মুখের পানে চেয়ে হাতখানি আমার মাথায় দিয়েছিলেন। স্নেহক্ষরা স্বরে বলেছিলেন—"ছিঃ, তোমাকে তো ওভাবে আমি তৈরি করি নি। তবে চোখে জল কেন ? মুছে ফেল। মুখ তোল। বহু কর্তব্য এখন তোমার সম্মুখে। এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে।"

না, পারি নি। পারি নি নিজেকে সামলাতে। মাথাটি ওই বিশাল বুকখানার উপর নেমে গিয়েছিল। চোখের জলে সারা বুকখানাই ভিজে গিয়েছিল। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আমায় শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মাথা তুলে দেখতে পেয়েছিলাম ঘরে যাঁরা ছিলেন কারও চোখই শুকনো নয়। বললেন—"দেখ, যা বলছি এরা কেউ তা বুঝছে না। তাই তোমার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছিলাম। যে সময়ের যা ব্যবস্থা তাইতো করতে হবে। শোন—ভোরে আমাকে গান শোনাতে হবে। তারপর এক চরিত ক'রে চণ্ডীপাঠ। আমার স্নানের জন্যে সর্বৌষধির জল এবং পথ্য যবাগু।" বললাম—"সবই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তারপর বললেন—"দেখ আজ থেকে বাইশটা দিন যদি এই দেহখানাকে ধরে রাখতে পার তা হলে আরও কিছুদিন তোমাদের মধ্যে থাকব।"

তাঁর ইচ্ছা এবং নির্দেশ মতই সমস্ত হতে থাকল। রোজ ৭।৮ খানা করে চিঠি, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী ভক্ত, সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুদের লেখা হত। সব চিঠিই একই সংবাদ বহন করত—"আমি অন্তিম শয্যায়—শেষ দেখা চাই।"

ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছিল বন্ধুবান্ধব, ভক্তের দল। চোখে তাদের মৌন বেদনার অশ্রু। সবার হৃদয়েই বিগলিত জাহ্নবীর মত মমতার অপ্রমেয় ধারা।

প্রতিটি দিনই ১৫।২০ জন বহিরাগতের যথোচিত সৎকার সম্বন্ধে সন্ধান নিতেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা, কাকেও বা শেষ উপদেশ দেওয়ার পর বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। অতিথিরা জলভরা চোখে বিদায় নিতেন। সে দৃশ্যটি হত অত্যন্ত মর্মবিদারী—অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

এইভাবেই একের পর এক দিন রাত্রিগুলো এসেছিল, চলেও

গিয়েছিল। উদ্বেগের রাতগুলোর অবসানে এসেছিল আলো ভরা দিন। সঙ্গে নিয়ে কত ভরসা—কতই না স্বপ্ন। আবার চলেও গিয়েছিল। যাওয়ার বেলা রেখে গিয়েছিল বিভীষিকাময় কালের উদ্বেগভরা করাল ছায়া।

২৯শে কার্তিক সন্ধ্যায় এসেছিলেন কাজী নজরুল, রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ রায় এবং আরও দুই তিন জন। কাজীসাহেব রোগীর দরজার বাহির থেকেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 'দাদা' সম্বোধন ক'রে একেবারে যোগীরাজের শেষ শয্যায় গিয়ে বসে পড়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল একটা অন্তরমথিত করা চাপা ক্রন্দনের রেশ। অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে যোগীরাজ ডেকেছিলেন "কাজী ভায়া।" দুজনেই দুজনের পানে চেয়েছিলেন। দৃষ্টিদ্বারেই হয়েছিল পরস্পরের হৃদয় বিনিময়। শিবকল্প গুরুর সাথে হয়েছিল অন্তরঙ্গ অনুগত শিষ্যের মিলন। সে কী মহিমময় দৃশ্য।

কিছুটা শান্ত হয়ে কাজীসাহেব সহসা যোগীরাজের সম্মুখে মাটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়েছিলেন। রোগীর দিকেই পা দুখানি প্রসারিত। আরম্ভ করেছিলেন এক যৌগিক মুদ্রা, সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে "হুঁ মা" মন্ত্রোচ্চারণ। এই প্রক্রিয়া প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা একই নাগাড়ে চলার পর মাত্র এক পেয়ালা চা খেয়েই গিয়েছিলেন বিশ্রাম করতে।

সে কালরাত্রিটাও যথারীতি অবসান হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল নতুন দিনের নতুন রবি পূবের আকাশে। প্রাতঃস্নান সেরে কাজী-সাহেব রোগীর ঘরেই ধ্যানে বসেছিলেন। তারপর সঙ্গীত। জীবনের অচ্যুত সারথীর প্রিয় সঙ্গীতগুলো একটার পর একটা। সব শেষে শ্রীগুরুর শেষ আদেশ "কাজী ভায়া।" এবার শেষ গান "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা।"

নিজেকে ধরে রাখা কাজীসাহেবের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারেন নি। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বলেছিলেন—"দাদা, স্বধামের কথা কি আজ সত্যই মনে পড়েছে? আমাদের কি সত্যই ছেড়ে যাবেন?" স্নেহঝরা-কণ্ঠে যোগীরাজ বলেছিলেন "কাজী! ভাই! শিক্ষা দিতে তো কার্পণ্য করি নি। তবে এ দুর্বলতা কেন?" কাজীসাহেব তদুত্তরে—"দাদা! বুঝি সবই কিন্তু স্নায়ুগুলো যে ছিঁড়ে যাচ্ছে দাদা। অতি কষ্টে অত্যন্তদরদ দিয়ে তাঁর জীবন-রথের সারথীকে তাঁর অতি প্রিয় গান শুনিয়ে শ্রীগুরুর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। মরজীবনে এই তাঁর শেষ গান শোনা।

সেই দিনের একটা বৈশিষ্ট্য, আজ স্মৃতিসাগর মন্থন করতে গিয়ে ধরা পড়ল। সেদিন দুপুরে আর কাকেও চিঠি লিখতে বলেন নি। কেন বলেন নি? তিনি বুঝেছিলেন যে আর কাকেও ডেকে লাভ নাই। আর দেখা হবে না। তারা এসে শূন্য মন্দির দেখে সজল চোখে ফিরে যাবে।

সেই দিনই (৩০ কার্তিক) রাতের গাড়িতে অতিথিরা বিদায় নিয়েছিলেন। পূর্ব-পূর্ব রাতের মত সে রাতও প্রভাত হয়েছিল।

আজ মার্গশীর্ষ মাসের প্রথম প্রভাত। ১লা অগ্রহায়ণ।

সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতি তিনশো পঁয়ষট্টিটি রেখা দেওয়ালের গায়ে এঁকে নিয়ে, রোজ একটা করে মুছে ফেলে স্বল্পায়ু সত্যবানের আয়ুগণনা করেছিলেন। আমিও সেই রকম আমার মনের পাতায় বাইশটি রেখা এঁকে নিয়ে প্রতিটি প্রভাতে একটা ক'রে মুছে ফেলে দিন গণনা ক'রে এলাম। নির্ভুল গণনা। আজ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে একটা মুছে ফেলে দেখি আর একটা মাত্র রেখাই অবশিষ্ট। আর সেটাই বাইশতম সংখ্যাসূচক। গোনা দিনগুলো একে একে সবই ফুরিয়ে গেল। আজকের কালরাত্রি অবসানের প্রতীক্ষার জন্যে

আর কোন রেখাই মনের পাতায় অবশিষ্ট থাকবে না। পড়ে থাকবে শুধু একটা মুছে দেওয়া দাগ—একটা অস্পষ্ট স্মৃতি।

এই মরভূম থেকে মানুষের চির-বিদায় নেওয়ার পিছনে রয়েছে একটা অনন্ত বেদনার রেশ। এত মায়া, এত মমতা, এত ভালবাসা—তবু সময় এলেই চলে যেতে হয়—চলে যায় পরম পরিণামকে স্পর্শ করতে। চির তীর্থাভিসারী জীব জন্মজন্মান্তরের খেয়া ঘাটগুলো পার হতে হতে এগিয়ে চলেছে—চলেছে চিরসুন্দরের পদপ্রান্তে—চিরদুর্লভের রূপাতীত রূপসাগরে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। মানুষ পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত। মানুষের জীবন যেন তীর্থপথের একটা চটিতে অবস্থান। পথিক জীবনের চল্‌তি পথে অকস্মাৎ হয় পরিচয়—হয় মিলন। বহুর সঙ্গে হয় মেলামেশা, হাসি, গান। এ যেন ঠিক নদীর স্রোতে ভেসে চলা ঝরাপাতার ক্ষণিকের জন্য কূল ছুঁয়ে যাওয়া। রাত্রি প্রভাত হলেই নিঃসঙ্গ পথিকের আবার একক পথ যাত্রা সেই অদেখা-অজানা-মহাতীর্থ অভিমুখে। কালরাত্রির শেষ মাসে নেপথ্যের চির-অর্গলমুক্ত দ্বারপথে নিতল নীরবতার বুক থেকে ভেসে আসে বাণীহীন ডাক—ডাক দেয় শুকতারা—ডাক দেয় প্রভাত—হাতছানি দেয় দূর—সুদূর।

•

আজ সকাল থেকেই মনটা যেন একটা অজানা আতঙ্কে পরিপূ । বেশ উপলব্ধি করতে পারছি যেন একটা কালোছায়া চারিদিক থেকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। স্থির নিশ্চিত হলাম যে শিবকল্প সত্যাশ্রয়ী মহাযোগীর মুখের কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তিনি সেদিন নির্দিষ্ট দিনটাই জানিয়ে দিয়েছেন। কেবল সমগ্র পরিবার যাতে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে ভেঙে না পড়ে তাই ঐ একটা 'যদি'র অলংকারে সাজিয়ে বলেছিলেন। সমগ্র পরিবারটির দৃষ্টিটা একটু অস্পষ্ট একটু অস্বচ্ছ থাক। একটা ক্ষীণ আশার প্রদীপ শিখা তাদের মনে জ্বলতে থাক।

শেষ রাত্রে বলেছিলেন, "আমাকে শুইয়ে দাও।" আজ ভোর থেকেই স্বাভাবিকভাবে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। একুশটা দিন তাঁকে বিছানায় স্বাভাবিকভাবে শুতে দেখি নি। দিনমানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়াভাবে বসেই থাকতেন। রাত্রে আমার ঘাড়ের উপর মাথা রেখে শিশুর মত দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বেশ ৩।৪ ঘণ্টা এক নাগাড়ে বসে বসেই ঘুমাতেন। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে গান এবং চণ্ডীপাঠ শুনবেন। আজ যেন সবই ব্যতিক্রম, তাঁর ঘুমও ভাঙল না ঘুম ভাঙালামও না। তাই আজ আর ভোরে গান বা চণ্ডীপাঠও শুনলেন না। বুঝি আজ চাওয়া পাওয়ার সব প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে তাই মনোবীণার তারে ঝঙ্কার দিচ্ছে 'ইতি'র পরিসমাপ্তি-মূলক সুর। বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে চেতনার স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে গেছে চরম ও পরম লাভের কৃতার্থতা। নির্বিকল্প সমাধির প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত মহাসাধকের জীবনে 'ইতি'র পর তো আর কিছুই থাকে না।

বেলা বাড়ল। ঘুমও ভাঙল। ফলের রস খাওয়ান হল। ওষুধও খেলেন। ২।৪টি ক'রে কথাও বলছেন। পরিবারবর্গের মনে যেন একটা নিবু নিবু আশার প্রদীপ দেখা যাচ্ছে। বলছেন "একটু যেন সুস্থ মনে হচ্ছে। আজ শুতে পেরেছেন।" হায়রে কুহকিনী আশা। তোরই কি অপর নাম মৃগ-তৃষ্ণিকা ?

হাতখানা নিয়ে নাড়ীটা পরীক্ষা করতেই বুকের মধ্যে একটা প্রবল শিহরণ অনুভব করলাম। এ কি ? নাড়ীতে যে সুস্পষ্ট-ভাবে বেজে উঠ্‌ছে 'রুদ্রবিষাণ' ! সন্দেহাতীত হওয়ার জন্যে কয়েক মিনিট পর আবার দেখলাম। অনেকক্ষণ ধরেই দেখলাম। না কোনও ভুল নাই। সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে মৃত্যুর পদধ্বনি। চোখের সম্মুখে দেখা দিল দুর্যোগের ঘন অন্ধকার।

বার বার মনকে বোঝালাম—আমার ভুল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো চিকিৎসকই নই। আমার বিভ্রান্ত মনের প্রতিক্রিয়া হবারই

বা বাধা কোথায়! কিন্তু না! অন্তর সে কথা শুনতে চায় না। কোনও মতেই স্বীকার করতে চায় না। আজকের কালরাত্রি যে কাটবে—প্রভাত সূর্যের তরুণ আলোর সাথে আবার যে তাঁর জীবনের আনন্দ-বাণী ফিরে আসবে—এ আশ্বাস আমার অন্তর কিছুতেই দিচ্ছে না। অন্তর দেবতার কাছে বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছি এ সুযোগে আমাকে ধৈর্যহারা কোরো না। আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত কোরো না।

সকলের সামনে যেতে কেমন যেন ভয় হচ্ছে। কি জানি কোনও দুর্বল মুহূর্তে যদি ভিতরের প্রলয় ঝড় কোনও ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে—যদি নিজেকে সামলাতে না পারি। তাই আজ একটু দূরে দূরেই রয়েছি। রোগী আজ স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোচ্ছেন।

মনের ভিতর বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছে। এ দুঃসহ বেদনার কথা প্রকাশ করব কার কাছে। বলতে পারি একমাত্র আমার অন্তরঙ্গ এবং পরম সুহৃদ ভূদেব সেনের কাছে—যিনি আমার প্রতিটি কর্তব্যের নিত্য সহচর—প্রতিটি রাত্রে যিনি আমার পাশে থেকে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নেন। কিন্তু তিনি আজ এই সময় অনুপস্থিত। দূরগ্রামে গেছেন তাঁর এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখার জন্যে। ফিরে আসবেন সন্ধ্যায়। বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর প্রচণ্ড আলোড়ন নিয়ে একটা নির্জন ঘরে গেলাম। ডুবে গেলাম চিন্তার রাজ্যে।

কতক্ষণ ডুবে ছিলাম জানি না। সহসা যেন মনে হল অন্তর্লোক থেকে কে বলে উঠল—"কাঁদবার জন্যে সমস্ত জীবন পড়ে রইল শক্ত হও। বহু কর্তব্য এখনও বাকী।" মনে পড়ে গেল প্রথম দিনের প্রথম কথা "বহু কর্তব্য এখন তোমার।" অন্তর্যামী মহামানব আজকের এই অবস্থারই কি ইঙ্গিত সেদিন দিয়েছিলেন? আজও কি সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন? একটা বিরাট দুশ্চিন্তা এসে মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। এ মহাদায় থেকে কেমন ক'রে উদ্ধার পাব?

সহসা ভূদেব সেন কবিরাজের গলা কানে এল। চিন্তার রাজ্য থেকে নেমে এলাম রূঢ় বাস্তবের বুকে। তাঁকে বললাম—"কতক্ষণ এসেছেন?" বললেন, "এই এলাম।" বললাম—"রোগীর ঘরে গিয়েছিলেন? বললেন—"না। কেমন আছেন?" বললাম—"গিয়ে দেখুন। আমি তাঁর নাড়ীতে রুদ্রের শিঙাধ্বনি শুনতে পেয়েছি।" মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে কবিরাজ মশাই দ্রুত গতিতে রোগীর ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন বেরিয়ে এলেন—গতি তাঁর শ্লথ—মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। মুখের পানে চেয়ে বললেন—"আপনার সন্দেহ অভ্রান্ত।" জিজ্ঞাসা করলাম—"সময়?" উত্তরে বললেন—"রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পূর্বে নয় "

অলস মন্থর পায়ে নেমে আসছে রাত্রি। তন্দ্রাহীনা রাত্রি। স্থবিরা, জরতী রাত্রি কথাও বলে না। কানেও শোনে না। অস্পষ্ট আলোয় ঘরখানা মনে হচ্ছে অবাস্তব। যেন সেখানে বিরাজ করছে শ্মশান স্তব্ধতা। কেবল দেওয়াল ঘড়িটি টিকটিক শব্দে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। চলেছে অনন্তের পানে। কালরাত্রিও ধীরে ধীরে গভীর হতে গভীরতর হয়ে আসছে। একটানা ঝিল্লীরব মুখরিত ঘনতম আঁধারের বুক চিরে ভেসে আসছে কালপেঁচার ডাক। ভেসে আসছে একটা বিদায় ব্যথার করুণ বেহাগ সুরের রেশ। যেন একটা সব-হারানো ক্রন্দনের হাহাকার ধ্বনি। মনে জাগছে ভয়।

সেই ভয়ঙ্করী কালরাত্রির কথা আজও ভুলি নি। ভুলব না কোনদিন।

আত্মার পরমাত্মীয় ওই মহামানব আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে। দুই পাশে কম্পিত চিত্ত দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু নিদ্রাহীন নির্নিমেষ চোখে বসে রয়েছি। চেয়ে রয়েছি তাঁর আত্ম সমাহিত প্রসন্ন মুখের পানে। দেহখানি তাঁর নিশ্চল। ধ্যানস্থির। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আঁখি দুটি নিমীলিত।

দুই জনেই নীরব। মুখের ভাষা দুজনেরই স্তব্ধ। চোখের ভাষায় মাঝে মাঝে ভাবের আদান প্রদান চলছে। মুখের ভাষা বন্ধ তাই বিভ্রান্ত মন নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার গতি রোধ হয়ে গেল। মনে এল—এতদিন ধরে এই যে চিঠি লেখালেখি ক'রে এত জনকে নিজের রোগশয্যা পাশে টেনে এনে দাঁড় করালেন এর মূলে কি কেবল শেষ দেখা, শেষ বিদায় নেওয়া? ভিতরের মন বলল—সাক্ষাৎই শেষ কথা সন্দেহ নাই তবু এর পিছনের পটভূমিতে আরও কিছু রয়েছে।

মানুষের সঙ্গাভিলাষী মানবপ্রেমিক যোগীরাজের' রোগ যন্ত্রণা অপেক্ষাও নিঃসঙ্গতার ব্যথাটাই তীব্র, অসহনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলিতে কত মানুষের জীবনবীণার ঝঙ্কার রণিত হয়েছে তাঁর চিন্তায়—তাঁর আনন্দে তাঁর বৈষয়িকতার ফাঁকে ফাঁকে। কত জীবন কত ছোট ছোট ধারা এসে তাঁর মহাজীবন ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে। সেই জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হয়েছে—সরে আসতে হয়েছে দূরে সীমাহীন নিঃসঙ্গতার কুলহারা মহাপারাবারে। শাশ্বত প্রেমের অমৃত তরঙ্গে অবগাহন ক'রে প্রাণের সর্বানুস্যূতির অনুভূতি ধন্য মহাসাধক নিজেকে সেই সমষ্টি প্রাণের অসীমতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ব্যষ্টিজীবনের সসীমতার অন্তরাল তাঁর পূর্ণপ্রাণের উৎসারণ পথটি অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। তাঁদের স্পর্শ তিনি লাভ করতে চেয়েছিলেন ওই চিঠির মাধ্যমে। চিঠি নৈঃসঙ্গবোধপীড়িত মনের সান্ত্বনা পাওয়ার উপায়। চিঠির মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় দূরের প্রিয়জনের সাহচর্য—তাদের স্নেহস্পর্শ।

কে যেন রোগীর ঘরে প্রবেশ করল। ছিন্ন হয়ে গেল চিন্তাজাল। যোগীরাজ একই ভাবে শবাসনে রয়েছেন। চোখে মুখে আসন্ন মৃত্যুর কোন একটা রেখা মাত্র নাই। মনে হচ্ছে শবাসনে ধ্যান-

স্তিমিত নেত্রে কোন এক অদৃশ্য অব্যক্ত আনন্দময় লোকে বিরাজ করছেন।

দেওয়াল ঘড়িতে আড়াইটা বাজার সঙ্কেত করল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। উদ্বেগাকুল কম্পিত চিত্ত দুই বন্ধু চেয়ে রয়েছি যোগীর মুখের পানে পলকহীন চোখে।

সহসা মহাযোগী চোখ মেললেন কিন্তু সে দৃষ্টি যেন কোন অদৃশ্য লক্ষ্যের পানে নিবদ্ধ। যেন সে দৃষ্টির সম্মুখে কোনও অন্তরাল নাই। যেন তা প্রসারিত কোন সীমাহারা নিরুদ্দেশের পানে।

তাঁর সহধর্মিণী ঐ ঘরেই ছিলেন? সাময়িক নিদ্রাবিষ্ট হয়ত শিবকল্প স্বামীর অন্তিম ইচ্ছায়—উঠে এসে স্বামীর মুখ পানে চেয়ে রইলেন। সুদূর প্রসারিত দৃষ্টির প্রসারতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এল। শেষে নিবদ্ধ হল তাঁর মরজীবনের নিত্য সহচরী অর্ধাঙ্গিনীর অশ্রুভারে অবনত বিষাদক্লিষ্ট নয়ন দুটির উপর। দুজনেই চেয়ে রইলেন পলকহীন চোখে দুজনের পানে। যেন নয়নাভাষেই হল তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান যেন শেষ বিদায় চেয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে নয়নপল্লব নিমীলিত হয়ে এল। মহাতাপস যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে জেগে রইল পরম তৃপ্তি পরম প্রাপ্তির অনির্বচনীয়তা।

বাষট্টি

মরমী বৈষ্ণব কবি লিখে গেছেন :—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥"

সবই শূন্য। গৃহ শূন্য। শূন্য মন্দির। দেবতা চলে গেছেন। নিঃসঙ্গ শূন্যতাই কেবল ছুটে আসছে সব কিছুকে গ্রাস করতে। সবখান থেকে গুমরে উঠছে সমগ্র সত্তা। হারিয়ে গেল এক পরম সম্পদ।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে কাল। জগৎ সংহারক মহাকাল। সবকিছুকে গ্রাস করতে।

"জগৎ সংহারকঃ কালঃ ইদংসর্বং গ্রসিষ্যতি।" নিজের নৃত্যচ্ছন্দে নিজেই বিভোর। রূপ নাই। কথা নাই। নাই কোনও পরিচয়। সবকিছু উপেক্ষা ক'রে ভ্রূক্ষেপহীন গতিছন্দে এক লক্ষ্যে ধেয়ে চলেছে কাল। নটরাজ মহাকাল। মানে না কোনও প্রতিরোধ। সে শক্তিও আবিষ্কৃত হয় নি। হবেও না কোনও দিন।

অনন্ত কোটি বিশ্বও ছুটে চলেছে। চলেছে মহাকালের ছন্দে ছন্দে পা ফেলে। জগৎ চলমান। কিছুই স্থির নয়। সবই চলছে। চলছে নিজ নিজ চরম পরিণামের পানে। পরম পরিপূর্ণতার অভিমুখে।

তাই ক্ষণপূর্বে যা ছিল বর্তমান—এই মুহূর্তে তা হ'য়ে গেল

অতীত। আজকের রাতের কথা আগামী প্রাতেই হয়ে যাবে ইতিকথা। "আছেন" হয়ে গেল 'ছিলেন'।

আলো থেকে অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আলো। ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত। অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত। রূপ থেকে ভাব। ভাব হ'তে রূপ।

"ভাব পেতে চায় ভাবের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা॥"

বার বার যাওয়া আসার মধ্যে দিয়েই চলছে জীবনের পথ-পরিক্রমা। জীব চির অভিসারী। সীমাহীন অজানা পথের চির-অভিযাত্রী। পথই তার আশ্রয়। পথই টেনে নিয়ে যায় পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে—সংসারকে পিছনে ফেলে কোন নিরুদ্দেশ-অচেনা-অধরার পিছনে। কোথায় এ যাত্রা পথের শেষ? কোথায় সমাপ্তি?

সমাপ্তি সেই জীবনে—সেই মৃত্যুহীন অমৃতলোকে। চির-নির্বাক—চির-অনুত্তর—পরশাতীতের ছোঁয়ায় যেখানে সবাই হয়ে ওঠে মধুময়—অমৃতময়। আকাশ, বাতাস, জল, স্থল সবখান থেকে যেখানে গভীর ওঙ্কারে সামঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়—

"ওঁম্ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ
সন্তোষধি, মধুনক্তমুতোষসঃ, মধুবৎ পার্থিবং রজঃ,
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতাঃ, মধুমান্নো বনস্পতি, মধুমান্
অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁম্ মধু, ওঁম্ মধু,
ওঁম্ মধু।
ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট

বরদাচরণ রচিত কয়েকখানি যোগসঙ্গীত

(১)

আমার জীবন হবে কি সারা (মা)
যে দিন কালী কালী কালী বলে
সবাই মোরে দিবে সাড়া।
জ্ঞান নেত্র উঠ্‌বে ফুটে, ভাবসমাধি আসবে ছুটে
তখন, সবাই মিলে বলবে কালী
আমি হ'য়ে রব মড়া।
রইবে না আর ভেদাভেদ
উচ্চ নীচে কোনও প্রভেদ
তখন, বলবে সবাই মনে প্রাণে
মা যে মোদের ওঁঙ্কারা।
মনের আঁধার যাবে ছুটে, মাকে দেখব সর্ব ঘটে
তখন, ব্রহ্মানন্দে রইল ভুলে
হ'য়ে রব পাগল পারা॥

(২)

অমিয় নিকেতনে যাবি যদি আয় না।
কত খেলা খেলবি রে মন, খেলাঘর তোর ভেঙে দেনা।
আকাশ পথে আগু হ'য়ে
জ্যোতির মাঝে মিশে গিয়ে

ওরে, শূন্য ক'রে সব বাসনা—পূর্ণাধারে থেকে যা না।
ভাবের ঘরে চুরি ক'রে
বেঁচে থাকা যাবে কি রে ?
নকল ছেড়ে আসল হ'য়ে—সর্বগত হয়ে যা না।
সেথা, ডাক্‌বে না কেউ পিছন থেকে
শুন্‌বি না কোন সুরের হানা
ভেদাভেদ সব যাবে ঘুচে
চিদানন্দে যাবে চেনা॥

(৩)

আমায় দেখা দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না
ছাড়ব না তো তোমায় আমি, যতই খেলা খেলাও না।
যেথা তোমার ইচ্ছা যেতে, যাওনা তুমি হরষ চিতে
ধরব আমি পিছন থেকে, পালাতে তো দেব না।
যেতে যেতে হবে ধন্দ, রাখব হিয়ায় ক'রে বন্ধ
জড়িয়ে আমি ধরব তোমায়, পালাতে তো দিব না।
যেথায় যাবে হব সাথী, জ্বালিয়ে নিয়ে চিতের বাতি
(তুমি) অরূপ হয়ে মিলিয়ে গেলে, আমিত্ব আর রাখব না॥

(৪)

পারে যাবি কে কোথা আয় না !
পারিস যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে পর পারে পহুচানা।
পারের কড়ি হৃদে ধরি দ্বিদলে মন বসা না
পাবি চিন্তাশূন্য ধ্যানগম্য পথের নিশানা।
আকাশ পথে আগু হয়ে জ্যোতির মাঝে ডুবে যা না
দেখবি তখন কার বা কি ধন, নকল যা, তা রবে না।
পেয়ে ব্রহ্মানন্দ হবি ধন্ধ, মনের আগুন রবে না
তখন সবার মাঝে 'আমি' হয়ে করনা সুখে আনাগোনা।

কিবা মোক্ষ কিবা মুক্তি লক্ষ্য কিছু থাক্‌বে না
ডুবে প্রেমের পাঁকে আলোর তলে 'আমিত্ব' আর রইব না ॥

(৫)

কি আছে কোথায় দেখিতে না পাই
খুঁজিয়া না পাই কাহারে
কি করিব বল পারি না বুঝিতে
কেন যেতে চাই জানি না ; শেষে
খুঁজেও পাইনা আমারে ।
নাই যে গো আদি নাহি তো অন্ত
নাহিক শান্তি নাই আনন্দ
নইলে শূন্য পূর্ণ ভাবেতে
পাই যে গো আমি তোমার ॥

(৬)

কি আর করিব আমি, যা কিছু আমার ছিল
দয়াল তুমিতো নিলে কেড়ে
সাধ মোর শুদ্ধ কর, অমিয় পরশে তব
মনের বেদনা যাক্‌ দূরে ।
তুমি ; বিতরি করুণা করিছ চূর্ণ সকল অহংকার
বিতরিয়া স্নেহ দিতেছে অশ্রু সব কাজে আমার ।
তুমি রাখ হে, ধর হে, বঁধু হে, সখা হে,
দিয়ে তব কৃপা এ দীনে—
আজ নিঃশেষ কর মোরে ॥

(৭),

কি বলে মা তোরে ডাকি, কিছুই খুঁজে না পাই
বুঝি না, ভাবি না কিছু কি যে করি কোথা যাই ।
কি নামে, কি রূপে তোরে ডাকিব দেখিব আমি
কভু শ্যামা বলে ডাকি কভু দিগম্বর স্বামী

কভু শ্যাম বসে রাধা, আকুল সুরে বাজায় বাঁশী
যে সুর শুনে ব্রজগোপীর হয়েছিল মন উদাসী।
দেখে শুনে দিশেহারা, হয়ে গেছি ছন্নছাড়া
(তাই) তুমি এসে আমার মাঝে লুকিয়ে আছ সকল ঠাঁই।
(মা) দেখব তোরে আমার মাঝে, পাই কিনা পাই খুঁজে
রাখব না আর আমার কিছু, যদি এবার তোরে না পাই ॥

(৮)

চঞ্চল মনের গতি কভু স্থির নাহি হয়
দাঁড়ায়ে জলধি মাঝে বায়ু যথা স্থির রয়
কি দেখিব কি শুনিব কত তৃষা মিটাইব
বাসনার মাঝে পড়ে হিতাহিত শূন্য হায়।
কিসে যে পুরিবে আশা, কত দিনে মিটে তৃষা
অনুক্ষণ চঞ্চল মন কখনও যে স্থির নয়।
"আমি" যতদিন রবে ততদিন দুঃখ ভবে
নাশিলে আমারে তবে দূর হবে সব ভয় ॥

বরদাচরণের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পত্রালাপ ছিল। একথা পূর্বে বলা হয়েছে। নিচে একখানি পত্রের অনুলিপি দেওয়া হল। মহাত্মা গান্ধীর পত্রের উত্তরে যোগীরাজ বরদাচরণ লিখেছেন। গান্ধীজীর প্রশ্ন ঃ—"অহিংসাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন কে ?"

বরদাবাবুর বক্তব্য ঃ—

(১) যিনি সমাধিস্থ।

(২) এইরূপ সমাধিসিদ্ধ পুরুষ অনাসক্ত কর্মী। অসমাধিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পরিকল্পিত এবং পরিচালিত কর্মে যে মানসিক সংকীর্ণতার স্পর্শ থাকে, এরূপ পুরুষের কর্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, এবং এই জন্য ইঁহার কৃতকর্ম ভগবৎ কর্মের রূপ পরিগ্রহ করে।

(৩) অনাসক্ত কর্ম করার পর ইহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ প্রেম লাভ হয়। এই প্রেম একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ, এবং কর্মকে ইহা পবিত্রতা ও ভগবদিচ্ছার উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে।

(৪) উপরিউক্ত সর্তগুলি পালন করা প্রয়োজন। কেবল মাত্র তখনই জীবনের সর্বস্তরে প্রকৃত অহিংসা উপলব্ধি এবং পালন করা সম্ভব। একখণ্ড প্রস্তর অথবা একটি কুদর্শন মৃত্তিকাস্তূপের মত আপাত দৃষ্টিতে প্রাণহীন, জড়বস্তুও তখন আর গন্তীর বহির্ভূত থাকে না। অনাসক্ত কর্মীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ বস্তুও তাহার তুচ্ছতা হারাইয়া ফেলে। অনাসক্ত কর্মী তখন বিশ্বলীলা উপভোগ করেন। তাহাতে অহিংসার কোনও স্থান নাই।

সত্যাগ্রহ নিম্নলিখিত বস্তুগুলির উপর নির্ভর করে ঃ—

১। পূর্ববর্ণিত অহিংসা।

২। অসহযোগ—ইহা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ।

(ক) শারীরিক অসহযোগ ঃ—

(১) ইন্দ্রিয় শুদ্ধি।

(২) পাকস্থলী শুদ্ধি।

(৩) বিশুদ্ধ জলবায়ু, আলোক গ্রহণ।

(৪) অনাড়ম্বর বাহুল্য বর্জিত পরিচ্ছদ পরিধান।

(৫) স্বচ্ছন্দ অঙ্গ সঞ্চালন।

(খ) মানসিক অসহযোগ ঃ—

(১) হৃদকেন্দ্রে মনের অবস্থান (অনাহত চক্রে)

(২) বিচার কেন্দ্রে মনের অবস্থান (আজ্ঞা চক্রে)

(৩) মস্তিষ্ক কেন্দ্রে মনের অবস্থান (সহস্রারে)

(৪) পূর্বোক্ত ১, ২, ৩, পূর্ণ শিক্ষা এবং বিকাশ প্রয়োজন।

ইহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিলেই চন্দ্রকলা অথবা পূর্ণ সূর্য দৃশ্যমান হইবে। এবং একটি বিশেষ অনুভূতির মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (সহস্রারে) উত্থান সুনিশ্চিতভাবে অনুভূত হইবে। ইহার পরই সমগ্র শরীরের